নাজু

– মানিক

নাজুর সঙ্গে পরিচয় কবে, কখন হয়েছিল তা বলতে পারবো না। তবে এতোটুকু বলতে পারি, যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন সে ক্লাস থৃতে। তারা আমাদের বাড়ির পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতো। পাশাপাশি বাসা হওয়ায় আসা–যাওয়া, কথা হতো। কখনো বা খেলার সঙ্গী কখনো বা সহপাঠী হিসেবে। এভাবে চলছিল।

আমি যখন ক্লাস এইটের ছাত্র তখন সবে এ দেশে হিন্দি সিনেমার প্রচলন হয়েছে অর্থাৎ টেলিভিশনের পর্দায় হিন্দি সিনেমা দেখা যায়। ওই হিন্দি সিনেমা দেখেই শিখেছি *হাম তুমকো পেয়ার করেগি, আই লাভ ইউ, তু মুঝে জান* ইত্যাদি।

অবশ্য এসবের বাংলা অর্থ জানতাম। তবে প্রেম ভালোবাসা বুঝতাম না। যা বুঝতাম তা হিন্দি সিনেমা দেখে।

একদিন বিকেলে দেখি স্কুল থেকে নাজু ফিরছে। আমার কাছে আসতেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আই লাভ ইউ। বলেই দিলাম এক দৌড়।

তিন চার দিন তার সঙ্গে দেখা নেই, কথা নেই।

একদিন সন্ধ্যায় তার ছোট বোন সিমু একটি চিরকুট হাতে দিয়ে বললো, নিন এটা আপু দিয়েছে।

হাতে নিয়ে খুলে দেখি পুরনো পত্রিকার ছেড়া পাতায় ঝকঝকে হাতের লেখা একটি বাক্য, *হাম তুমকো পেয়ার করেগি*।

এখানেই হয়তো বা আমাদের প্রেমের শুরু হতে পারতো কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওরা বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর আমিও এ বিষয়ে মাথা ঘামাইনি। কোথায় গেছে খুজে দেখিনি। হয়তো বা কথায় আছে, *চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়*। এটাই সত্য।

ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

একদিন বিকালে ক্লাস সিক্সে পড়ুয়া আমার চাচাতো বোন সুমনা এসে বললো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে, ছাদে চলো।

তার সঙ্গে ছাদে গেলাম। যা বললো তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। অবশ্য ছোট থেকে ওকে খুব স্নেহ করতাম।

সে বললো, জানো, মা বলেছেন, তোমার সঙ্গে নাকি আমার বিয়ে দেবেন। আমিও তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

আমি তো একেবারে থ ওরে বাবা! এ মেয়ে বলে কি?

কোনো কথা বলছিলাম না দেখে সে বললো, তুমি কিছু বলছো না যে? তুমি কি আমায় বিয়ে করবে না? তুমি কি আমায় পছন্দ করো না?

বললাম, বাবা মা যদি তোর সঙ্গে বিয়ে দেন তবে তো তোকেই বিয়ে করতে হবে। তোকে তো অপছন্দের কিছুই দেখছি না।

সে চলে যায়।

সেদিনের পর থেকে কিভাবে যেন আমরা একটি জুটি হয়ে যাই। এভাবেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিই।

তখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। জানি না কোন অপরাধে বিনা নোটিশে একদিন সুমনা অন্য একটি ছেলের হাত ধরে চলে যায়। সে অনেক কথা। তা আজ না হয় না বললাম।

সুমনা আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পর ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম। কোনো কিছুতেই ছন্দ খুজে পাচ্ছিলাম না। লেখাপড়ায়ও মন বসে না। মোটামুটি গোল্লায় যেতে বসেছিলাম।

এমনি একদিন সন্ধ্যায় আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু যে এখন প্রবাসী সেই শহিদ এসে বলেলো, চল তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। তোর ভালো লাগবে।

কোনো কথা না বলে তার সঙ্গে গেলাম। সে যেখানে নিয়ে গেল সেই বাসায় তন্বী তরুণী মেয়েটির সঙ্গে শহিদ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, ও এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। আমি মাঝে মধ্যে এসে ওকে পড়াই। তুই তো অংক ভালো বুঝিস, তুই আজ থেকে ওকে অংকটা দেখাবি।

দেখলাম, সেই মেয়ে আর কেউ নয়, সে আমারই পূর্ব পরিচিতা নাজু।

প্রতিদিন একবার হাজিরা দেয়া শুরু করি। তার সঙ্গে পড়ার চেয়ে ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ বেশি হতো। প্রায় সময় ও সুমনাকে ভুলে যেতে বলতো আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করতে বলতো। জানি না কখন যে নিজের অজান্তেই ওকে আবার ভালো লাগতে শুরু করেছিল!

একদিন কথার ছলে তাকে বলি, আজ তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। জানি না তুমি সেটা কিভাবে নেবে। অবশ্য মানা না মানাটা তোমার ব্যাপার।

সে বললো, কোনো প্রকার ভনিতা না করে কি বলবেন সরাসরি বলুন।

বললাম, যে কথাটি অবুঝ বেলায় বলেছিলাম খেলার ছলে সেই কথাটি আজ নতুন করে বলতে চাই।

সে যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাবার মতো পেল।

বললো, আমি তো সেদিন থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম যেদিন তোমার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হলো। তোমার প্রস্তাবে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে সব কিছু ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবে। তবেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে।

সেদিন থেকেই শুরু হলো আমার প্রেমের দ্বিতীয় ইনিংস। এভাব চলতে থাকলো কিছু দিন। কথায় আছে, *আকাশে চাদ উঠলে সবাই দেখে*। তেমনি আমাদের সম্পর্কের কথাও বাসার সকলে জেনে যায়। অবশ্য এর মধ্যে আমি এইচএসসি এবং নাজু এসএসসি পাস করে।

আমাদের এ সম্পর্ক কেউ মেনে নিতে চায় না। শুরু হয় দুই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

জানাজানি হবার পর থেকে দুজনের আগের মতো কথা হয় না। শুধু ছাদের ওপর থেকে দেখা এবং মাঝে মধ্যে চিঠি দেয়া-নেয়া।

যখন দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব চরমে তখন আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

নাজুকে বিয়ে দেয়ার জন্য ঢাকায় নেয়া হয়। কিন্তু তার অমতের কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এদিকে আমার বাবা বড়লোকের এক দুলালির সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। আর তখনই জানতে পারি, ছোটবেলায় তারা অর্থাৎ নাজুরা চলে যাবার কারণ ছিল আমার বাবাই। তিনি কিভাবে যেন আমাদের বিষয়টি টের পেয়েছিলেন। তাই তিনি নাজুর মাকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছিলেন। এ জন্যই দুই পরিবারের কেউ আমাদের এ সম্পর্ক মেনে নিতে নারাজ।

দ্বিতীয়বার কষ্ট পাবো এই ভয়ে নাজুকে হারাতে চাই না। কিন্তু একেবারে যে নিজের করে নেবো, তাও সম্ভব হচ্ছে না বেকার থাকার কারণে।

তাই নিয়মিত ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে দিন কাটাই। অনেক সময় নিজেকে শেষ করে দিতে চাইতাম। রাতে চার পাচটা করে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতাম মরার জন্য। কিন্তু জেগে দেখতাম মরিনি। এভাবে যে কতোদিন গেছে বলতে পারবো না!

একদিন সিনেমার নায়কের মতো ওদের বাসায় গিয়ে ওর মায়ের মুখোমুখি হয়ে বলি, আমি নাজুকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি পারলে ঠেকান।

তিনি সাহস করে বলেছিলেন, আমার মেয়ে তোর সঙ্গে গেলে নিয়ে যা।

নাজুকে আমার সঙ্গে চলে আসার আহ্বান করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে আমাকে চলে যেতে বলে।

তার এই ব্যবহারে একেবারে বোকা সেজে দাড়িয়েছিলাম।

তার মা বিজয়ের হাসি হেসে বললো, কই, নিয়ে যা আমার মেয়েকে তোর সঙ্গে।

বিষয়টি এর মধ্যে বাড়িতে জানাজানি হলে আমার মা এসে আমাকে নিয়ে যান।

তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, যে করেই হোক নাজুকে আমার বিয়ে করতে হবে। তা না হয় নিজেকে শেষ করে দেবো। এক প্যাকেট ইদুর মারার ওষুধ কিনে তাকে শেষবারের মতো খবর পাঠালাম। যদি না আসে আমার লাশ দেখবে।

ভালোবাসার টানেই না একটি জীবন শেষ হয়ে যায় এই ভয়ে আমার সঙ্গে নাজু দেখা করতে এসেছিল।

তাকে ইদুর মারা ওষুধ দেখিয়ে বললাম, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হও তবে এই বিষ খেয়ে মরে যাবো। আর আমার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে তুমি এবং তোমার মা।

সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে বললো, তুমি মেধাবী ছাত্র, আমার মতো সামান্য মেয়ের জন্য তোমার সুন্দর জীবনটা শেষ করবে কেন? আমার চেয়ে ভালো মেয়ের সঙ্গে তোমার বাবা মা বিয়ে দেবেন। প্লিজ, তুমি এমন কিছু করো না যার জন্য আমার দুর্নাম হয়।

বললাম, ফিরিয়েই যখন দেবে তাহলে কেন নতুন করে স্বপ্ন দেখালে? তবে কি মনে করবো, মেয়ে জাতিটাই বেঈমান? তুমি তো আমাকে চেনো না, আমি যা বলি তা-ই করি। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে। না করলে তুমি আমার শেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকবে।

অবশেষে শহিদের মধ্যস্থতায় নাজু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। বিয়ের পর্ব, বিয়ের পরবর্তী অবস্থা সে অনেক কথা। আজ এ পর্যন্তই।

নাজু এখন আমার দুই সন্তান, মুনীয়া এবং ফাহিমের গর্বিত মা।

এখন মাঝে মধ্যে হাসি পায় আমার আগের পাগলামির কথা মনে হলে। মাঝে মধ্যে নাজুও খোটা দেয়, তুমি আমার জন্য কতোই না পাগলামি করেছো।

এ পর্যন্ত আমরা সুখী দম্পতি। ভালোবাসার বন্ধনে অটুট আছি।

কাউরিয়াপাড়া, নরসিংদী থেকে

জন্মদিনের উপহার

- সুখন

এশা আমার ঠোটের ওপর আলতোভাবে ঠোটটা রাখলো। মনে হলো কতো জনম ধরে ও তৃষ্ণার্ত।

আমি ওকে প্রবলভাবে চেপে ধরতেই কার যেন স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল।

বাস্তবে কখনো এসব না হলেও এ ধরনের স্বপ্ন প্রায়ই দেখি এবং দুঃখ মেশানো প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে ছটফট করে জেগে উঠি। এবার জেগে উঠে ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগলো।

ছোট বোন তমা ডাকছে, ভাইয়া ওঠো, তোমার মোবাইল বাজছে।

ঘড়িতে এখন বাজে সন্ধ্যা ছয়টা। আমার মোবাইলে সচরাচর ফোন আসে না। তাই খানিকটা আনন্দ নিয়ে কল রিসিভ করতে যাব কিন্তু ফোনটা কেটে গেল। আমি আর এ ব্যর্থতা নিয়ে মাথা ঘামালাম না এবং পরদিন সকালে প্রাইভেট স্যারের বাসায় পড়তে গেলাম।

স্যারের বাসায় আমরা সর্বমোট সাতজন। তার মধ্যে আমি একাই ছেলে। এ জন্য আমাকে প্রায়ই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। আর কেন জানি ওদের সামনে গেলেই উল্টাপাল্টা কথা বলতে শুরু করি।

ওরা বড্ড ফাজিল টাইপের মেয়ে। আমার শারীরিক, মানসিক আর সর্বোপরি চলাফেরার মধ্যে তেমন বিশেষ ত্রুটি না থাকলেও বিভিন্ন ধরনের হাস্যকর ত্রুটি বের করে তা নিয়ে ওদের মধ্যে প্রায়ই হাসাহাসি এবং একে ওপরকে খোচাখুচি চলে। আমার এসব রীতিমতো অসহ্য মনে হয়।

কিন্তু এতো সবের মধ্যেও *এশা* নামের সেই আয়ত নয়না, সুকেশী মেয়েটিকে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। ও খুব সম্ভবত সেটা বুঝতে পারে এবং এ ব্যাপারটাই ওই মেয়েদের অন্যতম হাসি পরিহাসের বিষয়। এ জন্য আমি যতোদূর সম্ভব ওদেরকে এড়িয়ে চলি এবং প্রত্যেকটা কথা ছাকনি দিয়ে ছেকে বলি।

স্যারের সামনে বসে এসব কথা চিন্তা করছিলাম।

এমন সময় স্যার শান্ত গলায় ডাকলেন, সুজয়।

জি স্যার।

তুমি না কি ইদানীং কাউকে খুব ডিস্টার্ব করছো?

অবাক হয়ে বললাম, কই! না তো।

স্যার বললেন, কি এশা, ডিস্টার্ব করে?

এবার এশা আমার দিকে তাকালো। তাকিয়েই বললো, জি স্যার।

ওপাশ থেকে ফাজিল মেয়েগুলো যোগ করলো, এশার বাসায় ফোন করে আর এশার বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করে।

শশী বললো, গতকার রাতে নাকি এশার বাসার সামনের দোকনে চা খাচ্ছিল আর আমার ভাই সম্রাট ওকে দেখেছিল।

প্রীতি বললো, স্যার, ও কয়েকদিন ধরে আমার সঙ্গে জোর করে কথা বলার চেষ্টা করছে।

এসব বলার পর আমার বলার কিছু থাকে না। আমি রাগে, দুঃখে, অভিমানে, লজ্জায় কারও দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কেবলই মনে মনে বললাম, এশা, শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাকে লজ্জা দিলে!

এ ব্যাপারে স্যার চূড়ান্ত অ্যাকশন নিয়ে আমাকে অপমান করে অবশেষে ক্ষান্ত হলেন।

এটাতেই শেষ নয়। প্রাইভেট শেষে বাড়ি ফিরছি। মেয়েদের দলটি আমার সামনে এসে থামলো। না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিলাম। এমন মুহূর্তে বেশ কয়েকটি মন্তব্য আমার কানে এলো। এর মধ্যে একটা হচ্ছে বেহায়া কোথাকার। বাবা মা মনে হয় জন্মের সময় লজ্জার নাড়ি কেটে দিয়েছে ...।

ঘটনার পরের দিন থেকে আর স্যারের বাসায় গেলাম না।

এর ঠিক দুই মাস পরে এশার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এশা আমাকে অদ্ভুত স্বরে ডাকলো, এই সুজয়।

যখন না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিলাম ঠিক তখুনি একটা নরম হাত আমার এই তুচ্ছ হাতকে স্পর্শ করলো। আমার এই ছোট জীবনে এ ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। আগে কখনো এমন ধরনের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিনি। জীবনে যতোটুকু আত্মপ্রসাদ পেয়েছি, সবই মনে হয় এ সামান্য স্পর্শের কাছে একেবারেই তুচ্ছ। ভেতরের এই প্রচণ্ড অস্থির আলোড়ন বাইরে প্রকাশ না করে কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, কি ব্যাপার, এখনো শখ মেটেনি?

সে স্পষ্ট স্বরে বললো, *না।* সেদিন আমি তেমন কিছুই বলিনি। আমার বান্ধবীরাই সব বলেছিল। তুমি আমাকে যে রকম ভেবেছিলে তা আসলে নয়। আমার বান্ধবীরাই এসব করেছিল যার জন্য আমি অনুতপ্ত। এতটা খারাপ হোক তা আমি চাইনি।

এখন তোমার জন্য কি করতে পারি?

মৃদু হেসে জবাব দিল, আপাতত আমাকে ক্ষমা করো।

ওর সেই সরল মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে বললাম, আচ্ছা, যাও ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ও আমার বললো, *তাহলে আসি কেমন!* বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই চলে গেল।

কি অভদ্র মেয়ে রে বাবা! এশাকে দেখার পর আমি আগের অপমানের কথা নিমেষেই ভুলে গিয়েছিলাম। আবার এখন ও চলে যাবার পর সেই আগের অজানা ব্যথা, সেই কাছে পাবার আকুলতা এবং সর্বোপরি সেই বাধ ভাঙা দুর্নিবার আকর্ষণ কেবলই বেসুরোভাবে হৃদয়ের গভীরতম নিবিড়ে বার বার বাজতে লাগলো। আমি সেই সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনে মনে বললাম, যা শালা, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

পড়ার টেবিলে কতোক্ষণ বসেছিলাম জানি না। কলিংবেলটা টুং টাং কাচের শব্দে বেজে উঠলো। ভাবলাম বাসায় তো কেউ নেই। তাহলে হয়তো ছোট বোনের স্যার এসেছে। তাই ওকে খুলতে বললাম।

বেশ খানিকক্ষণ পর তমা এসে বললো, ভাইয়া, তোমার গেস্ট এসেছে। বলেই মুখ টিপে একটা হাসি দিয়ে দিল ছুট।

ড্রয়িংরুমে যেতেই স্বপ্ন দৃশ্যের মতো দেখি এশা সোফায় বসে ছবি দেখছে।

ওকে দেখে আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হলো। একটু অন্যদিকে ফিরে চোখের পানি মুছলাম। অনেকক্ষণ থেকেই অপলক দৃষ্টি দিয়ে বিভোরভাবে ওকে দেখছি।

চোখাচোখি হতেই ও ওঠে এসে বললো, তুমি কেমন মানুষ বলো তো। কতোক্ষণ ধরে তোমার জন্য বসে আছি আর তোমার হদিশ নেই।

কিছু বলতে যাব কিন্তু কথাগুলো দলা পাকিয়ে গলার কাছে আটকে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগলো।

খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে ও আবার বললো, আজকে আমার জন্মদিন। মনে আছে আজকে সকালে তোমার কাছে আমার কিছু জিনিস পাওনা ছিল।

মাথা নাড়লাম।

ততোক্ষণে ও আমার খুব কাছে চলে এসেছে। বললো, সুজয়, তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। কখন নিতে আসবে?

আমি ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকালাম।

এ মুহূর্তে এই কঠিন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গভীর ভালোবাসায় আমার হাত দুটোকে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

পূর্ব রামপুরা, ঢাকা থেকে

প্রতিজ্ঞা

ফোনে ও বললো, কবে আসবে। ও সব সময় ওরকমই বলে। কিন্তু ও জানে আমার আসার সুযোগ ও করতে পারবে না। তবে যেদিন ও আমার আসার সুযোগ করতে পারে সেদিন আর বলে না কবে আসবে। সেদিন নির্দিষ্ট সময় বলে দেয় আসার জন্য।

কবি, সাহিত্যিকের মতো ওর রূপের বর্ণনা দেবো না। তবে সর্বগ্রাসী *গ্রহণ* যেমন চাদ বা সূর্যকে গ্রাস করে নেয়, তেমনি সেও আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

উত্তরে বললাম, যেদিন বলবে সেদিনই আসবো। এর দুই দিন পর ফোনে আবার ও বললো, আগামীকাল সকাল এগারটার সময় আসবে।

শর্ত দিয়ে বললাম, যেহেতু এখন রজমান মাস, তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা কেউ-ই যাবো না।

দুজনাই প্রতিজ্ঞা করলাম।

ভাবলাম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যাবে কি না? পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। পৃথিবীতে এর চেয়েও বড় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়েছে।

পরদিন সময় মতো ওর কাছে উপস্থিত হলাম। কথা অনুযায়ী আজ শুধু তোমাকে দেখবো, কথা বললো এবং শুধু আদর করবো। ওকে বললাম।

আচ্ছা। ও বললো ও আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পাসে বসলো।

আমিও স্বাভাবিকভাবে তার স্পর্শে পুলকিত হচ্ছি।

এ তো কি দেখছো? অনেক তো দেখেছো। এবার একটু আদর করো না? ও বললো।

তার ঠোটে আদর করতে থাকি।

হঠাৎ ও আমার দুই ঠোট ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই গ্রাস করে ফেললো এবং বিরামহীনভাবে চুষতে থাকে ঠিক ছোট বাচ্চা যেমন ফিডারের নিপল চোষে।

আমিও নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাপছে।

ও আরেকটু এগিয়ে গিয়ে আমার বেল্ট খুলে ফেললো। প্যান্টও খুলে ফেললো। তারপরও আমার ঠোট ছাড়ার নামগন্ধ নেই ওর মধ্যে।

পাগল হয়ে যাবো বোধহয়। জন ডান (John Donne)–এর একটি কবিতার কথা মনে পড়ে গেল, সূর্যকে উদ্দেশ্যে করে কবি বলেছেন, *ওহে বৃদ্ধ অলস সূর্য, শৃংখলা ভঙ্গ করে কেন তুমি জানালা দিয়ে উকি দিচ্ছো? আমাদের ঘুম ভাঙাচ্ছো, তুমি কি জানোনা এটা ভালোবাসার মরসুম? তুমি বরং যে ছাত্র নিয়মিত দেরিতে স্কুলে যায় তার ঘুম ভাঙাও।*

ও এতো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, কোনো কিছুতে পরোয়া করছিল না। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিল।

কখন তারও শরীর থেকে কাপড় খুলে গেছে ও বুঝতে পেরেছে কি না জানি না।

আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে জোর করে মুক্ত করে একটু দূরে বিছানায় বসলাম। আর পারছি না, ওর বার বার আহ্বানে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

তার একটি হিমালয়ের চূড়া আমার মুখের ভেতর নিজেই দিয়ে দিয়েছে, আরেকটি আমার হাতে সপে দিয়েছে। সুবোধ বালকের মতো কাজ করে যাচ্ছি।

আমার একটা হাত নিয়ে তার ঝরনাধারায় স্পর্শ করিয়ে ও বললো, দেখো তো কিভাবে ভিজে গেছে, কেমন করে আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো?

এ কথা বলেই সে আমাকে তার বুকের ওপর শুইয়ে দিয়ে ব্যাকুলভাবে আহ্বান জানালো।

আমি এক রকম জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম বললাম, দেখো আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি রোজা শেষ হতে, তারপরই তো আমরা বরাবরের মতো মিলিত হতে পারবো। প্লিজ, একটু অপেক্ষা করো। তাছাড়া আমরা দুজনাই তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবো না। নিজেকে যদি নিজে দমন করতে না পারি তবে মানুষ আর পশুতে পার্থক্য কি?

ও তখন অঝোর ধারায় কেদে ফেললো।

আর কিছুতেই সামাল দিতে পারছিলাম না। ওকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি ওর চোখের পানিতে আমার জামা ভিজে গেছে। দুই হাত দিয়ে ওর মুখটা তুলে চুমু দিয়ে বললাম, আজ এতো বছর ধরে তোমাকে ভালোবেসেছি, শরীর মন দুটোই আমরা এক অপরকে এতো বেশি দিয়েছি যে, কেউ কারো প্রতি কোনো কৃপণতা করেছি বলে মনে হয়নি। মানুষের চাওয়ার সঙ্গে যদি পাওয়া মিলে যায় তবে সেটা যে কতো ভয়ঙ্করভাবে আকর্ষণীয় হয় তা তুমি এতোদিনে আমার ভালোবাসার খেলায় বুঝে নিয়েছো। তোমার দেহ তো

দেহ নয় যেন জ্বলন্ত অগ্নিগিরি। ওই অগ্নিগিরিতে এতোবার ঝাপ দিয়েছি, অথচ এতোটুকুও অনাগ্রহ অনুভব করিনি, তোমার অফুরন্ত যৌবন সুধা তুমি আমাকে যেভাবে পান করতে দিয়েছো, পিপাসা নিবারণ করেছি, ধন্য হয়েছি। যেভাবে তোমাকে দেখতে চেয়েছি, তুমি দেখিয়েছো তোমার রত্নের ভাণ্ডার। কোনোদিন বাধা দাওনি, বরং উজাড় করে তুমিই দেহের প্রতিটি অঙ্গ আমাকে দেখিয়েছো। নির্জীব নারীর মতো নীরব থাকোনি। তাহলে কেন তুমি মাত্র একটি দিনের জন্য ধৈর্য ধরতে পারছো না? যে তোমাকে এতো ভালোবাসে তার জন্য না হয় একটু ত্যাগ করলেই অন্তত আমার প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করেই।

তার চোখের পানি তখনো থামেনি। কিন্তু ওই চোখের পানিতে আলতো করে চুম খেয়ে বিদায় নিতে চাইলে ও বিদায় দিল।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মানুষ

– ঝিলন

মানুষ পৃথিবীর সেরা জীব। এ মানুষ দোষ–গুণে ভরা দুই পা–ওয়ালা শ্রেষ্ঠ জীব। প্রত্যেক মানুষের তিন প্রকার চরিত্র আছে – যা সে প্রকাশ্যে দেখিয়ে বেড়ায় যা সত্যিকার আছে, এবং যা সে মনে করে তার আছে। যে নাকি নিজের সমালোচনা করতে পারে সে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। আমি বা আমরা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করি। সমান আলোচনা সমালোচনা করি না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দোষ ত্রুটি খুজে বের করি।

যারা দক্ষ লেখক তারা নাকি একটু আবেগী হন। তাদের লেখায় আবেগ প্রকাশ পায়। সমাজের সবাই কবি না। কেউ কেউ কবি আর অধিকাংশ মানুষের মাঝে বাস করে কবিত্ব। তবে যার ভাবনায় শরীরী রূপ লাভ করে তাকেই আমরা কবি বলি। আবার আপনি কবি বলে যা ইচ্ছে তা–ই লিখে পাঠকদের ভোলাতে পারবেন না। পাঠকদের বিচার শক্তি প্রবল। একটা লেখা দিয়ে ভোলাতে পারবেন, পরের দুটো হাফ ভোলাতে পারনবেন, তৃতীয়টায় আর পারবেন না। অবশ্যই লেখার ভেতরে রস কষ–গন্ধ থাকতেই হবে। তা না হলে পাঠকের তুষ্টি হবে না।

একজন পাঠক অপেক্ষা করেন একটা ভালো লেখা পড়তে। তেমনি একজন আরেকজনের জন্য অপেক্ষার পালা। তবে এখন *অপেক্ষার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়* কথাটা পুরাপুরি সত্য নয়। যেমন সত্যি *সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না*। সময়ের সংগে সবাই তাল মিলিয়ে চলে যাচ্ছে।

যখন কেউ দ্রুত গন্তব্যে যেতে চায় তখন সে বিভিন্ন যানবাহনের সাহায্য চায়। সে যদি ট্রেনে যেতে চায়, ট্রেন মিস করলে, লাইন বাসে যেতে চাইবে, তাও মিস করলে প্রাইভেট গাড়িতে যেতেই চায়। অবেশষে পদযুগল শেষ ভরসা। তবুও গন্তব্যে পৌছাটা যেন জরুরি। সুতরাং অপেক্ষার যুগ শেষ বলা চলে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে আমরা মানুষরূপী কখনও লেখক, কখনো সমালোচক, কখনো অপেক্ষার যাত্রী। আমরা মানুষ বহুরূপী। একটি মানুষ একটি সত্তা। মানুষই পারে অসাধ্য সাধন করতে। এ মানুষের জীবন বড়ই অদ্ভুত! কখনো হাসে কখনো কাদে। তবুও এ জগতে মানুষ চেনা ও মানুষের জটিল চরিত্র বোঝা সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার।

ভোলা সদর থেকে

পরীক্ষা

– মোহাম্মদ ফরমান আলী

বিকেলে কফি হাউসে যাওয়া প্রায় রুটিন মাফিক কাজ হয়ে দাড়িয়েছে আনোয়ারের। তাই বিকেলে তাড়াহুড়ো করে ঘুম থেকে জেগে উঠে বাইরে বের হওয়ার পোশাকটা পরে নিল আনোয়ার। আজ আবার নাসরিনের আসার কথা। ছয়টার আগেই তাকে পৌছে যেতে হবে ধানমন্ডির কফি হাউসে।

আনোয়ার আর নাসিরনের বাড়ির মাঝে দূরত্ব খুব বেশি নয়। আনোয়ার এবার পৃন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ইন্টার্নি প্রায় শেষ করেছে। এবার ও একটা চাকরি পেলে আর নাসরিন ডিগ্রি পাস করে বের হলেই তাদের বিয়ে হবে। পারিবারিকভাবে এটাই ঠিক হয়ে আছে।

ধানমন্ডির কফি হাউসে পৌছে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল আনোয়ার।

নাসরিন হয়তো আজও দেরি করে আসবে।

পত্রিকার পাতায় চোখ রাখে আনোয়ার। একটি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল। একটি বিদেশি কম্পানি বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বেশ কিছু মুদ্রণবিদ নিয়োগ করবে। কিন্তু শর্ত হলো কম্পানির পছন্দ মতো দেশে চাকরি করতে হবে।

বিজ্ঞাপনটি নিয়ে ভাবছে আনোয়ার।

এমন সময় নাসরিন এসে উপস্থিত হলো। পরনে নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ, নীল টিপ আর হাতের ব্যাগটিও নীল।

আনোয়ার বললো, কি ব্যাপার, নীল পরীর আজও আধ ঘন্টা পরে আগমন!

নাসরিন উত্তর দেয়, ঘরের কাজ সেরে তবেই না আসবো!

খাবারের অর্ডার দিয়ে বিজ্ঞাপনটি নাসিরনকে দেখায় আনোয়ার।

নাসরিন খুবই উৎসাহ দেখায়।

অবশ্য এতে তারও স্বার্থ আছে। আনোয়ার চাকরি পেলে তাদের বিয়ের রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে আনোয়ারের ইচ্ছা ছিল বিদেশ গিয়ে আরো পড়াশোনা করার।

নাসরিনের জেদাজেদিতেই বিদেশি কম্পানির সঙ্গে আনোয়ার যোগাযোগ করলো। ইন্টারভিউ দেয়ার পর তাকে জানানো হলো, তাকে নিয়োগ দেয়া হবে। ইন্টার্নি শেষ করার পর সে যেন আবার যোগাযোগ করে।

অতঃপর আরো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আনোয়ারেরও চাকরি হয়ে গেল। প্রথমে তাদেরকে পাঠানো হবে কম্পানির সিংগাপুর শাখায়। সেখানে মুদ্রণের মান-নিয়ন্ত্রণ বিভাগে তাদের কাজ করতে হবে।

ভাইয়া-ভাবী, কাকা-কাকি ও বাবা-মায়ের যত্নে বড় হয়েছে আনোয়ার। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিল আনোয়ার। নাসরিনকে বললো, তোমার পরীক্ষাটা শেষ হোক। তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবো আমার কাছে। এখনই বিয়ে করলে তোমার পড়াশোনা আর শেষ হবে না।

এরপর আনোয়ার চলে গেল বিদেশ। পরবর্তী কয়েক মাস আনোয়ারের ভালোই কাটলো নতুন দেশ ও নতুন পরিবেশে। এর কিছু দিন পরই দেশের সঙ্গে আনোয়ারের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল।

আনোয়ারের বড় ভাই অনেক চেষ্টা করেও আনোয়ারের কোনো সন্ধান করতে পারলেন না। কম্পানিতে খোজখবর নিয়েও কোনো কিছু জানতে পারলেন না।

এর কিছু দিন পর হঠাৎ একদিন একটি চিঠি পেল নাসরিন।

নাসরিন,

আজ আমার সৌভাগ্যে যে, তোমাকে চিঠি লিখতে পারছি। কয়েকদিন আগে আমাদের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। আমি মুখে প্রচণ্ড আঘাত পাই আর সেই আঘাতে আমার মুখ একদিকে বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কপালে দুঃখ আছে বলে প্রাণে বেচে গেছি। আগামী সপ্তাহে দেশে ফিরে আসছি। ভাইয়া-ভাবীর সঙ্গে এয়ারপোর্টে থেকো।

ইতি

তোমার আনোয়ার

নাসরিন চিঠি পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। না, সে এয়ারপোর্টে যাবে না। বিকৃত চেহারার কোনো পুরুষের সঙ্গে সে ঘর সংসার করতে পারবে না। সে কাউকে করুণা করতে পারবে না।

পরের সপ্তাহে এক স্মার্ট তরুণের সঙ্গে ধানমন্ডির কফি হাউসে গেল নাসরিন। এই তরুণের সঙ্গেই সম্ভবত বিয়ে হবে নাসরিনের।

কিন্তু কফি হাউসে ঢুকেই আকাশ থেকে পড়লো নাসরিন। এ কি? সেই পরিচিত চেয়ারটিতে বসে আছে আনোয়ার! তার চেহারা তো কোথাও কোনো বিকৃত হয়নি! আগের সেই চেহারা।

চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এলো আনোয়ার হতবাক নাসরিনের সামনে। বললো, নাসরিন, তুমি হেরে গেলে। আমি একটি মিথ্যা সংবাদ পাঠিয়ে বুঝতে পারলাম তোমার মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা নেই। এক্ষেত্রে ছেলেরাই সব সময় এগিয়ে। কায়েসরাই সব সময় লাইলীর জন্য মজনু হয় আর ফরহাদরা শিরির জন্য পাথর খুড়ে কূপ খনন করে। আমি আগামী সপ্তাহে আবার সিংগাপুর চলে যাচ্ছি। আর হয়তো কখনো দেখা হবে কি না জানি না। ভালো থাকো, সুখে থেকো, গুডবাই।

এটুকু বলেই নাসরিনকে আবার হতবাক করে হুড়-হুড় করে বেরিয়ে গেল আনোয়ার।

দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল থেকে

বিচিত্র মন

– আহসান শফিক

কবে কোথায় যেন পড়েছিলাম ষোল থেকে বিশ বছরের প্রত্যেকের জীবনে বিপরীত লিঙ্গের কেউ না কেউ আসে। হয়তো তা কারো জীবনে দিয়ে যায় একরাশ দখিনা বাতাস, হয়তো কারো জীবন তা হয়ে যায় লণ্ডভণ্ড বৈশাখি ঝড়ের মতো। তার রেখা থেকে যায় আমৃত্যু। কারো জীবনে একটু আচড়ের মতো। আবার কারো জীবনে দগদগে ঘা হয়ে যন্ত্রণা দেয় অহর্নিশ।

তখন যদিও বয়স কম ছিল তবুও মনে করেছিলাম এগুলো হয়তো লেখকের কল্পনার কথা যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিলই নেই। জীবন তো আর উপন্যাসের পাতা নয়। কিন্তু তখন কি আর জানতাম যে, উপন্যাসের চেয়ে জীবন অনেক অনেক রঙিন, আবার কখনো কঠোর কঠিন বাস্তব, রূঢ় যা উপন্যাসকেও হার মানায়।

তখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি এবং গ্রুপ থিয়েটারও করি। নাটক নিয়ে কখনো *মহিলা সমিতি*, কখনো *টিএসসি।* আবার *ডাকসু*-র সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হওয়াতে কখনো শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, এ হল, সেই হল করে ভালোই চলছিল দিনগুলো।

এর মাঝে একদিন অপরাজেয় বাংলার সামনে আমরা কয়েক বন্ধু-বান্ধবী মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। শীতের সকালে সেই আড্ডায় চায়ের সঙ্গে সিগারেটও চলছিল।

আড্ডাতে অনেকের সঙ্গে রুহিও ছিল। সে হঠাৎ বললো, সিগারেটের গন্ধ তার একদম পছন্দ নয়। তাছাড়া সিগারেট যে ছেলেরা খায় তাদেরকেও আমার পছন্দ নয়।

তখন রেগে গিয়ে বললাম, তোর পছন্দ-অপছন্দে আমার কি এসে যায়? তুই কি আমার ঘরের বৌ? তোর ভালো না লাগলে সরে বস অথবা চলে যা এখান থেকে।

সে সত্যি সত্যিই সেদিন সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।

ঘটনা সেখানেই শেষ সবাই তা ভেবে ছিল এবং আমিও।

কিন্তু কয়েকদিন পর আবারও আড্ডা। এবার স্থান টিএসসি–তে। গ্রুপের সবার সঙ্গে রুহিও ছিল। তবে রুহিকে আজ একটু অন্য রকম লাগছিল। যদিও সেদিন পহেলা ফাগুন উপলক্ষে সবাই বাসন্তি শাড়িতে খুব সেজেছিল, খোপায় পরেছিল গাদার মালা। রুহির খোপায় ছিল রজনীগন্ধা। এর জন্যই ওকে সবার চেয়ে আলাদা লাগছিল।

চায়ের পরে যখন আবার সিগারেট ধরাবো তখন রুহি হঠাৎ এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো, এটা তোর জন্য।

ঘটনার আকস্মিকতায় কতোক্ষণ ওর দিকে চেয়েছিলাম জানি না। স্বাভাবিক হয়েছিলাম কামালের কথা শুনে। ফাজিল আমাকে বলেছিল, নে, কেল্লা ফতে। নাটকওয়ালাদের এই একগুণ, মেয়ে পটাতে ওস্তাদ ওরা।

সেদিন সবাই ওর কথায় হেসে উঠেছিল।

তারপর দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। আমি ওর সঙ্গে শো–র ফাকে ফাকে মিশতাম। আস্তে আস্তে কখন আড্ডা ছেড়ে দুজনে লাইব্রেরির পেছনে টিএসসিতে বা কোথাও দূরে শহরের বাইরে চলে যেতাম।

ঘটনা শুধু আর ইউনিভার্সিটির গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রইলো না। সাথী সব জেনে ফেললো।

আমাদের পাড়ারই এক ছেলে ছিল। সে আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই এক জুনিয়র ছাত্র। তার মাধ্যমে সাথীর কানে আমার আর সীমার কথাটা চাউর হয়ে যায়।

যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি, সাথীর সঙ্গে তখন থেকেই আমার সম্পর্ক। সাথী ছিল তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বোন। বন্ধু, বন্ধুর পরিবার এবং আমাদের পরিবারেও সবাই এ সম্পর্কের কথা জানতো।

আসলেই রুহির আহ্বানও যেমন উপেক্ষা করতে পারতাম না আবার সাথীকে কষ্ট দেয়ারও সাধ্য আমার ছিল না।

সাথী সব জেনে আস্তে আস্তে আমার থেকে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিচ্ছিল তা বুঝতে পারতাম।

আমি ওকে কিছুই বলতে পারতাম না। অনেক চেষ্টা করেছি ওর মুখোমুখি হতে।

ও কিছুতেই আমাকে সেই সুযোগ দিতো না। আমার আশপাশেই সে ভিড়তো না। আমাকে এড়িয়ে চলতো।

কোনো উপায় না দেখে আমার বন্ধু অর্থাৎ সাথীর ভাইকে বললাম এর একটা সমাধান দিতে।

সে আমাকে বললো, দেখ, তোরা বড় হয়েছিস, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়ছিস, তোদের সমস্যা তোদেরই সমাধান করা উচিত। তোর পক্ষ নিয়ে সাথীকে কিছুই বলতে পারবো না। সরি।

এদিকে সাথীর উপেক্ষা আমাকে কেমন উদাসীন করে তুললো। একদিকে সাথীর উপেক্ষার যন্ত্রণা, অন্যদিকে পৌরুষে আঘাত।

রুহির সঙ্গ আমার ভালো লাগতো না আর। ওকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। ভাবলাম পরীক্ষাই দেবো না। নাটক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বেশি করে।

চাদনী রাত সাথীর খুব প্রিয় ছিল। চাদনী রাতে ছাদে ওঠে একা তারাদের দীপালি উৎসব দেখতাম। আগে সাথী এমন পরিবেশে ওদের ছাদে এসে দাড়াতো। আমরা চাদের আলোতে একে অন্যের সঙ্গে ইশারায় কথা বলতাম। গরমের রাতে হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে ছাদে আসতাম।

সাথী আমার ব্যায়াম করা চওড়া কাধ এবং বুক দেখে বলতো, *বীর পুরুষ*।

এখন আমার মনে হয় আমি একটা কাপুরুষ। একটা মেয়ের জন্য সব ছাড়তে বসেছি। যদিও চেষ্টা করছি সব কিছু স্বাভাবিকভাবে করতে তবুও পারছি না।

ওই বছর আর পরীক্ষা দেয়া হলো না।

রুহিও কেমন করে জানি সাথীর কথা জেনে যায়।

একদিন আমাকে জিজ্ঞাস করাতে সব বলি ওকে। কিন্তু রুহি আমাকে বলে, নাটকের লোকগুলো নাকি ভণ্ড, অসৎ। ওকে নাকি ওর বন্ধুরা বলেছিল আমার সঙ্গে সম্পর্ক না করতে। তারপরও ও করেছে, আমি নাকি অন্য রকম। তাছাড়া আমি তো রেডিও বা টিভি স্টার নই। গ্রুপ থিয়েটার কর্মী। তাই ও ভেবেছিল, আমি নাকি ভালো, অন্যদের মতো না।

এরপর অনার্স পাস করে রুহি বিয়ে করে কানাডায় চলে যায়।

আমি আরো একা, নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। সিগারেটের মাত্রা গেল বেড়ে। আর্ট কলেজ হস্টেল (আশির দশকে), বস্তিতে যাতায়াত বেড়ে গেল, গাজা খাওয়ার নেশায়। বাংলা মোটরের আনাচে-কানাচে যতো ওষুধের দোকান ছিল সবাই আমাকে চিনতে শুরু করলো। সোনাড্রল, ম্যানডেক্স কিনতে গেলে এখন আর দোকানিরা প্রশ্ন করে না। অনায়াসে সব নেশা জাতীয় ওষুধ দিয়ে দেয়। মাঝে মধ্যে পুলিশের ভয়ে চানখার পুল, ঢাকা মেডিকাল কলেজের আশপাশ, মিটফোর্ড থেকেও ওষুধগুলো সংগ্রহ করতাম। নেশায় বুদ হয়ে থাকতে ভালো লাগতো। নেশা করে সারা দিন ঘুমাতাম, সন্ধ্যায় বের হতাম ওষুধ সংগ্রহে।

এভাবে কেটে যায় দুই বছর। পরে পরিবারের সহায়তায় আস্তে আস্তে নেশা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলাম। আবার ক্লাস করা শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে আমার ব্যাচের সবাই মাস্টার্স করে বের হয়ে গেছে। আমি জুনিয়রদের সঙ্গে ক্লাস করছি। যদিও খারাপ লাগতো তবুও কোনো উপায় নেই।

এর মধ্যেই গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে ইতি টেনেছি।

এখন শুধু একটাই ভাবনা, পড়ালেখা শেষ করে ইউনিভার্সিটি ছাড়া। আসলে আমার মনে হয় নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমার নেই। না হলে আমার দগদগে ঘা খাওয়া জীবনে আবার কেন রিমার সঙ্গে জড়াবো!

এবারও রিমার দিক থেকেই সাড়াটা বেশি ছিল।

যথাসম্ভব চেষ্টা করতাম ওকে এড়িয়ে চলতে। পারলাম না। তবে এবার ওকে সব বললাম।

ও শুধু বললো, কোনো সমস্যা নেই। এটা জীবনের ধর্ম। এমনটা হতেই পারে। এখন তো আর তোমার কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এখন শুধু তুমি আমার, শুধুই আমার।

রিমার কথায় মুগ্ধ হলাম। ওর সহযোগিতায় লেখাপড়া শেষ করলাম।

তারপর ভালো চাকরি। ওকে বিয়ে, এক ছেলে, এক মেয়ের সুখী পরিবার এখন আমরা। আমি এখন কানাডায় সেটলড।

সাথীর বিয়ে হয়েছিল। শুনেছি সে নাকি কিছু দিন মানসিক হাসপাতালে ছিল। আজ আর ওর কোনো খবর জানি না। শুধু গভীর রাতে, অলস দুপুরে, বুকের এক কোণায় কোথায় যেন করুণ রাগিণী বাজে ওর জন্য। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমারই জন্য ও মেন্টাল হসপিটালে গিয়েছিল। এ ভেবে নিজেকে বেশি অপরাধী লাগে। অন্তত ক্ষমা চাওয়ার সুযোগই পেলাম না।

কানাডার কোনো মলে, শপিং সেন্টারে যখন ঘুরি একা কিংবা বৌ বাচ্চা নিয়ে অথবা যখন ১৪ ফেব্রুয়ারি ছেলেমেয়েরা ভ্যালেনটাইন উপলক্ষে গিফট কেনে, ফুল কেনে তখন অবচেতন মনে হয়তো রুহিকে খুজি। হয়তো দেখা হবে। কিন্তু আমার কানাডার আট বছরের জীবনে কখনো রুহির সঙ্গে কোথাও দেখা হয়নি। না হওয়াই ভালো। আমৃত্যু খুজবো যা রিমা কোনোদিন জানবে না।

জানি এটা অন্যায়। তারপরও তো মানুষের মন যে বড় বিচিত্র। তা না হলে সেই আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা এখনো কেন মনে পড়ে জীবনে মোটামুটি সব পাওয়ার পরও!

জানি না।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পরোপকারী

– নূর আয়েশা সিদ্দিকা

এমন কিছু মানুষ থাকে যারা তাদের কর্মময় জীবন এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যের গুণে খুব সহজেই স্থান করে নেয় অন্যের হৃদয়ের মণিকোঠায়। ঠিক তেমনি এক মানুষ ছিলেন মুন্নি ভাবী। আমার প্রবাস জীবনের প্রথম বন্ধু। আমার অনভিজ্ঞ সংসার জীবনে তার ছোটখাটো পরামর্শ, উৎসাহ, স্নেহমাখা বকুনি সব কিছুই ছিল আকাঙ্ক্ষিত ও উপভোগ্য। অসম্ভব অমায়িক ও সদাহাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটির মাঝে অন্যকে আপন করে নেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রবাস জীবনের কঠোর ব্যস্ততার মাঝেও তিনি যখন–তখন অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়াতে দ্বিধা করতেন না।

একবার আমার এক প্রতিবেশীর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেল। ব্যাপারটা ফোনে মুন্নিভাবীকে জানালাম। ভদ্রলোকের পরিবার সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিয়ে তিমি আমাকে বললেন, বিদেশ–বিভূইয়ে ভদ্রলোকের এই অসুস্থতার সময় আমাদের উচিত তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা।

তিনি নিজে তো বেশি কিছু টাকা দিলেনই, উপরন্তু আরো অনেকের কাছ থেকে কালেকশন করে দিলেন। শুধু তার পরামর্শেই আমরা আইডিবি (IDB)–তে বাংলাদেশি চাকরিজীবীদের কাছ হতে লাখ খানেক টাকা কালেক্ট করলাম এবং অন্যান্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকেও বেশ মোটা অংকের টাকা সংগ্রহ করে সেই পরিবারটিকে দিলাম।

এভাবে কখনো কারো অপারেশনের টাকা নেই, কারো চাকরি চলে গেছে এমন বিভিন্ন ইসুতে মুন্নিভাবীই উদ্যোগী হয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতেন। মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে তিনি উচু নিচুর পার্থক্য করতেন না। তিনি ছিলেন জেদ্দার বাংলাদেশিদের কাছে এক চিরচেনা মুখ, সবার স্বজন।

হঠাৎ জানতে পারি, এই ভালো মানুষটির দেহে বাসা বেধেছে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার। কষ্টের তীব্র লু হাওয়া বইতে শুরু করলো আমাদের হাজারও হৃদয়ে। পরিচিতজনরা সবাই তার আরোগ্যের জন্য কখনো ওমরা কখনো কোরআন খতম করে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানাতে লাগলো।

প্রথমবার কেমোথেরাপি দিয়ে যখন তিনি ইংল্যান্ড থেকে জেদ্দায় ফিরলেন তখন দেখা করতে গেলাম তার সঙ্গে। দেখলাম রোগ যাতনা তাকে কাতর করেছে ঠিকই কিন্তু তার হাসি মুখ কেড়ে নিতে পারেনি।

কথা প্রসঙ্গে বললেন, কি করবো বলো, আল্লাহ তো বলেছেন, ঈমান এনেছো বলে কি এমনিতেই ছেড়ে দেবো? আমি তো তোমাদের পরীক্ষা করবো। আমি আমার এ অসুখটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে নিচ্ছি। এই অসুখের জন্যও আল্লাহর কাছে শোকর। কেননা এ রোগের অছিলায় ইংল্যান্ডের অনেক বড় ডাক্তারদের কাছে ইসলামের নিমন্ত্রণ দেয়ার সুযোগ পেয়েছি।

তার কথা শুনে থ হয়ে গেলাম। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে বললাম, হে রব, তুমি পরীক্ষা করার জন্য যাকে বাছাই করেছো তিনি পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত পাত্রীই বটে।

অসুস্থতার মাঝেই একদিন সকালবেলা ফোন করে বললেন, জানো, আমাদের দেশের কিছু এনজিও দুঃস্থদেরকে ঋণ দেয় এবং চড়া হারে সুদসহ আদায় করে। আমি ভাবছি আমার মোহরানার টাকাসহ বেশ কিছু জমানো টাকা আছে। আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ফান্ড তৈরি করে সেগুলো কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারকে ঋণ হিসেবে দেবো। তারা স্বাবলম্বী হয়ে মূল টাকা ফেরত দিলে সেগুলো আবার অন্য কিছু পরিবারকে দেবো। এভাবে আমরা কিছু দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করতে পারি। এক্ষেত্রে চাইলে তোমরা যাকাতের টাকাও দিতে পারো।

ভাবীর কথা শুনে মনটা খুশিতে ভরে গেল। আসলে আমিও এ ধরনের কিছু একটা করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এতো সুন্দর পরিকল্পনা আমার মাথায়ই আসেনি।

আমাদের প্রবাসের কাঠখোট্টা জীবনে তিনি ছিলেন বর্ষার বৃষ্টির মতোই আকাঙ্ক্ষিত। কখনো আমরা তার সঙ্গে ছুটে বেড়িয়েছিন তায়েফের সবুজ প্রান্তর ছুয়ে, কখনো হেটেছি লোহিত সাগরের তীর ঘেষে আভার পথে। তিনি বলতেন, প্রকৃতির কাছাকাছি না গেলে স্রষ্টার সুনিপুণ তুলির ছোয়া আর জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না।

ঘাতক ব্যাধির কবল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য তার প্রিয়জনরা কখনো লন্ডন আবার কখনো জেদ্দায় ছুটছিলেন। তার রোগ যন্ত্রণা দেখে মনে মনে ভাবি, বিজ্ঞান আজ কতো উৎকর্ষতা লাভ করেছে, ক্লোন মানুষ জন্ম নিচ্ছে, পৃথিবীর সীমানা মাড়িয়ে আমরা মঙ্গলে অবস্থানের স্বপ্ন দেখছি, তারপরও সার্বিকভাবে আমাদের ক্ষমতা যে কতো ক্ষুদ্র সেটাই যেন মহান স্রষ্টা তিল তিল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

ইংল্যান্ডের ডাক্তারদের কাছ থেকে হতাশ হয়ে মুন্নিভাবী বাংলাদেশে ফিরে গেলেন।

ধীরে ধীরে ফেরারি হতে শুরু হলো তার বেচে থাকার স্বপ্ন। সপ্তাহ খানেক ধরেই খবর পাচ্ছিলাম তার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। তার রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধির খবর পেয়ে ছুটে গেলাম পবিত্র কাবা শরিফে। মহান রবের কাছে বার বার তার হায়াত ভিক্ষা চাইলাম।

কাবা তাওয়াফ করে বের হবার সময় কাবা চত্বরে জানাজার জন্য আনা সবুজ চাদরে ঢাকা একটি মৃতদেহ দেখে থমকে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো বেশ কিছু দিন আগে শোনা একটি গানের কথা, *রিটার্ন টিকেট হাতে নিয়ে এসেছি এই দুনিয়ায়। টাইম হলে যেতে হবে, যাওয়া ছাড়া নেই উপায়।*

মনে মনে মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, হে প্রভু, জীবন-মৃত্যুর শাশ্বত সত্যের অটুট বন্ধনে আবৃত। যে জীবন আমার সেই জীবনের বাকি দিনগুলো যেন হয় এই প্রিয় মানুষটির মতো স্রষ্টার আনুগত্যে, সৃষ্টির ভালোবাসায় হাজারো হৃদয়ের স্মরণের বন্দরে।

৩০ নভেম্বর হাজারো বেদনার্ত হৃদয়ের আকুতি আর প্রার্থনা সব কিছুকে পেছনে ফেলে কষ্টের নীলে মিশে একাকার হয়ে তিনি ঝরে পড়লেন। পাড়ি জমালেন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে।

আজ তার অনুপস্থিতিতে মনে ভেসে ওঠে তার বহু আলাপন, তার সান্নিধ্যের স্মৃতি। তার সঙ্গে রক্তের কোনো বন্ধন ছিল না। তারপরও প্রতিনিয়ত হৃদয়ের করিডোরে বয়ে যাওয়া কষ্টের তীব্রতা থেকেই অনুভব করি তার প্রিয়জনদের শোকার্ত হৃদয়ের স্পন্দন।

মুন্নিভাবীর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সউদি আরব থেকে

অশ্রুত সিক্ত

- প্রত্যয়

আমি সুবোধ বালকের মতো পলাশির যুদ্ধের তাৎপর্য পড়ছি আর ভাবছি মীর জাফরকে যদি একবার পেতাম তবে কি কি করতাম। পিঠের উপর র‍্যাকেটের গুতা খেয়ে বুঝলাম আমার যম হাজির।

ছুটির দিনে পড়া কিসের?

মিতুর উপদেশ মাখানো কথা শুনে ঘুরলাম।

আজো তোকে থৃ-জিরো-তে হারাবো।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মুখখানার প্রত্যুত্তরে শীতল কণ্ঠে বললাম, আমি এখন ব্যাডমিন্টন খেলবো না।

এবার মিতু রাগে ফেটে পড়লো, খেলবি কেন? কাপুরুষ কোথাকার। লজ্জা লাগে না প্রতিদিন আমার কাছে হারিস? বের হওয়ার জন্য মিতু উঠে দাড়ালো।

মিতুর কথায় চরমভাবে অপমানিত হলাম। ব্যাডমিন্টন খেলায় আমার মহল্লায় আমাকে হারানোর মতো কেউ নেই এটা জানি। কৃকেট কিংবা ফুটবলে হয়তো এ কথা বলতে পারবো না। কৃকেট মাঠে নামলে ছয় বল খেলবো। দুটো ছয়, দুটো চার। এরপর বোল্ড। ফুটবলে দুটো বল পাবো, গোল পোস্টে ঢুকিয়ে বসে থাকবো, কারো কাছে বল কাড়তে যাওয়া কিংবা গার্ড দেয়ার প্রতিই আমার যতো অনিচ্ছা। মিতুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম।

পাশের বাড়ির সৈকত আংকল–এর একমাত্র কন্যা মিতু। ব্যাংকের চাকরির সুবাদে এক বছর হলো এখানে এসেছে। মিতু আমার এক ক্লাস নিচে পড়ে। আমাকে হয়তো মানুষ মনে করে। কিন্তু পুরুষ এটা ভাবতেই মনে হয় ওর আপত্তি। ক্লাস সেভেনে পড়ে, তারপরও টি–শার্ট আর হাফ জিনস অথবা ব্লেজার ও ট্রাউজার্স ছাড়া অন্য কিছু পরতে দেখি না, অন্তত বাড়িতে।

অপর পক্ষে আমি ফার্স্ট ক্লাসের ভালো ছেলে। দুষ্টুমি কিংবা কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা আমার অভিধানে নেই। মেয়ে হলে তো আল্লাহ রক্ষা করো। এ জন্যই মিতুর কাছে হেরে যাই। ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। তবুও টি–শার্ট পরে আমার সঙ্গে খেলবে কেন? নিশ্চয়ই এখন কচি খুকি নয়! কচুরমুখীর মতো উদ্ধত কিছুর কাজ কি আমি জানি না তারপরও ওসব নিষিদ্ধ ছাড়া কিছুই ভাবার কথা কল্পনা করতে পারি না। ওর দিকে লজ্জায় থাকাতে পারি না। তাহলে খেলায় জিতবো কি করে! আবার না খেললে আম্মুর কাছে নালিশ। ফলে আমার ভাগ্যে বকুনি।

আমি যে পুরুষ এটা মিতুর উক্তিতে মনে পড়ে গেল।

থাম, আমি যদি হারি তবে দশবার কান ধরে উঠাবস করবো। প্রায় সিনেমার ডায়ালগ–এর মতো বলেই ফেললাম।

মিতু হাসছে। এই প্রথম আমার মনে হলো মিতু খুব সুন্দর। প্রথম পর্বে স্মরণকালের মিতুর সঙ্গে যে কোনোদিনের চেয়ে ভালো খেললাম। তবু এক পয়েন্টে হারলাম। দ্বিতীয় পর্বে তিন পয়েন্টে জিতলাম। মিতু লাফ দিয়ে গলা ধরে বললো, You are great. ইউ আর গ্রেট!

আমাদের বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে লনে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলি। হঠাৎ একটা লোক পিঠে ঝোলা, হয়তো হকার কিংবা ফেরিওয়ালা হবে, এসে হাজির। আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল বসুধা তুমি দ্বিখণ্ডিত হও আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি।

আমার মতো লজ্জাবতী গাছের গলা ধরেছে।

আমি–মিতু দুজনেই দাড়িয়ে স্ট্যাচুর মতো লোকটাকে দেখছি।

ব্যাডমিন্টন কোর্টের কাছে এসে আমাদের ইশারায় ডাকলেন। কাছে যেতেই লোকটা জানালেন, তিনি জ্যোতিষী। আমরা হাত দেখালে দেখবেন।

আব্বু–আম্মু শুনলে বকুনি দিতে পারেন। ওনার কাছে হাত দেখা শেখার বই আছে শুনে উৎসাহিত হয়ে কিনতে চাইলাম।

মিতুকে বসিয়ে এক দৌড়ে টাকা এনে দেখলাম মিতু আর লোকটা অবিরাম হাসছে। কেন বুঝতে পারলাম না আবার জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পেলাম না।

খেলার কথা বলতেই মিতু বললো, থাক। এর চেয়ে দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে বইটা পড়বো।

বাধ্য প্রাণীর মতো ওর সঙ্গে গেলাম।

মিতুদের বাড়ির চিলেকোঠায় উপযুক্ত জায়গা নির্বাচিত হলো। ভয় পেলেও জোতিষশাস্ত্র শেখার নেশায় মিতুর সঙ্গে যেতে হলো।

চিলেকোঠায় এসে মিতু একেবারে ভালো মানুষ হয়ে গেল। কতো সুন্দর করে কথা বললো।

নিজে নিজের হাত দেখা যায় না। তাই একে অপরের হাতের সঙ্গে বই–এর চিত্র মেলাতে লাগলাম। কোনটা ভাগ্য রেখা, আয়ু রেখা, হৃদয় রেখা ইত্যাদি।

মিতু আমার গা ঘেষে চলে আসে, আমি সরে যাই। হঠাৎ মিতুর ধমক খেলাম, হাদারাম। তুই সরে গেলে আমি বই দেখবো কি করে।

মিতু আরো গায়ে গা ঘেষে দেখতে লাগলো।

কেন জানি বার বার কেপে উঠছিলাম।

এবার দুজনে তিলক তত্ত্ব দেখতে লাগলাম। কোথায় তিল থাকলে ভাগ্য কেমন হয়। মুখে, ঠোটে, বুকে, পিঠে প্রভৃতি তিলের অর্থ কি।

প্রত্যয় তোর শার্ট খোল, তোর বুকে তিল আছে কি দেখবো।

আমি শার্ট খুলতে নারাজ। তারপরও খুলতে হলো। মিতু বুকে হাত বোলালো, তিল খুজে বের করলো আর লেকচার দিল। যেমন তুই খুব শয়তান হবি, মেয়েদের পিছে পিছে ঘুরবি ইত্যাদি।

আমার কাদতে ইচ্ছে করছিল।

এবার তার কোথায় তিল আছে সে জিজ্ঞাসা করলো।

বললাম, নাকের পাশে।

সত্যিই মিতুর নাকের পাশে খুব সুন্দর একটি তিল আছে। বই খুজে এর ব্যাখ্যা শোনালাম।

এরপর মিতু আমাকে যা বললো তাতে আমার সামনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, রবার্ট ক্লাইভ কিংবা মীর জাফর এসে দাড়ালেও এতটা হকচকিয়ে যেতাম না। শুধু হা করে বললাম, অ্যা?

কি বললাম বুঝতে পারলি না। আমার বুকে তিল আছে কি না দ্যাখ।

আমি জমে বরফ হয়ে দাড়িয়ে থাকলাম।

মিতু এবার কল্পনার অতীত ঘটনা ঘটালো।

একটানে ব্লেজারের চেন খুলে আমার মাথাটা টেনে চেপে ধরে বললো, দ্যাখ তিল আছে কি না।

মাথা তুললাম। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরছে। মৃগী রোগীর মতো হাত পা কাপছে।

মিতু এবার রহস্যময় হেসে বললো, ওই অন্ধকারে তিল দেখবি কি করে?

ব্লেজারটা সে একেবারে খুলে পাশে রেখে খাটে শুয়ে আমাকে টেনে নিল।

আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর বুকের ওপর শুয়ে পড়লাম।

মিতু আমার হাত তার স্তনের ওপর চেপে ধরে বললো, দ্যাখ কি শক্ত।

আমি যেন ঘুমের মধ্যে ছিলাম। তারপরও যেন ধীরে ধীরে হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছিলাম। কেমন শক্ত, অথচ তুল তুলে মাংস পিণ্ডে চাপ দিয়েই চলেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ক্লাস টুতে পড়ার সময় *ওয়ার্ড মিনিং* বই–এ ব্রেস্ট–এর মানে স্তন পড়েছিলাম।

টিউটর স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্যার, স্তন কি?

স্যার আমতা আমতা করে বোঝালেন, বাচ্চারা মায়ের যে অঙ্গ থেকে দুধ পায়।

আমি কি লজ্জাই না পেলাম! তিন দিন স্যারের দিকে না তাকিয়ে পড়লাম।

ওই মুহূর্তে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওই কথা অনুসরণ করছিলাম।

হঠাৎ মিতু মুখ তুলে আস্তে বললো, ওই লোকটা বলেছে, আমার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

আমি যেন পশু হয়ে গেলাম। ওর ট্রাউজার্স টেনে নিচে নামিয়ে দিলাম। প্যান্টের চেইন খুলে পাগলের মতো মিতুকে চেপে ধরে দেহের বিভিন্ন অংশে চুমু খেতে লাগলাম। আর যেন টর্নেডোর মতো কি করে চললাম।

মনে হলো আমার পায়ে ফুটবল কিংবা ওভারের প্রথম বল হাফ ভলি হয়ে লেগে আসছে। দুরন্ত বেগে ব্যাট ঘোড়াতে শুরু করেছি।

মিতু যেন একবার গুঙ্গিয়ে ওঠে আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলো।

কিন্তু আমি জানোয়ার হয়ে গেছি। আরো চেপে ধরলাম।

হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল মনে হলো। আমি আবার মানুষ হয়ে গেলাম। মিতুর দিকে তাকিয়ে দেখি দাতে দাত চেপে আছে, চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। মিতুর ট্রাউজার্সে রক্তের ছোপ। আমার কাদতে ইচ্ছে করছিল।

উঠে দাড়ালাম। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল।

এরপর মিতু আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ব্যাডমিন্টন খেলতে আসেনি।

এক মাস পর মিতুরা বদলি হয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় মিতু কাদছিল।

আমি বরফের মতো দাড়িয়ে বিদায় জানালাম।

আমার হাতে ছোট্ট গিফট ধরিয়ে মিতু চলে গেল।

ছোট চিরকুট, *এমন করলে কেন?*

পুরো পাচ বছর শুধু আত্মদহনে জ্বলেছি। মধ্যরাতে কেদে কেদে বালিশ ভিজিয়েছি। হয়তো অপরাধ বোধ অথবা প্রিয়জনকে হারানোর জন্য। নিয়তির পরিহাসে আবার মিতু আর আমি এক স্থানে। একই কলেজে আমি সেকেন্ড ইয়ারে, মিতু ফার্স্ট ইয়ারে। দুজনে এখন আরো কাছে, আরো খাটি, আরো পবিত্র। তবে তুই থেকে তুমি।

আংকল–এর ভাষায় মেডিকালে চান্স না পেলে জুটি ভেঙে দেবো।

বাবা–মায়ের ভাষায়, রেজাল্ট ভালো না হলে জুটি ভাঙবো।

আমরা হাসি। কারণ এ বন্ধন কংকৃট কিংবা ইস্পাত নয়। মাধ্যাকর্ষণ–এর চেয়ে বেশি আকর্ষণে আবদ্ধ হৃদয়ের বন্ধন।

মেহেরপুর থেকে

সুখী

ক্লাস নাইনে পড়া অবস্থাতেই অনুভব করেছি পাড়ার ছেলেরা কেন যেন আমাকে নিয়ে তোলপাড় করতো। কারণ আমি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলাম। ক্লাস টেনে থাকাকালীন প্রত্যক্ষ করলাম পুরুষের কি ধরনের আবদার, আবেদন আমার প্রতি। এমনকি আমার শ্রেণীর শিক্ষক থেকেও রক্ষা পেলাম না।

যৌবনে পদার্পণ করতে না করতেই অর্থাৎ এসএসসি পাস করার পর পরই আব্বা আমাকে বিয়ে দিয়ে পরপারে চলে গেলেন। ছাত্র জীবনের অবসান ঘটিয়ে সংসার জীবনে আবির্ভূত হলাম।

ভাইবোনদের সকলের বড় হওয়ায় বাবার অবর্তমানে বাবার সংসারের সকল দায়িত্ব অর্পিত হলো আমার ওপর। স্বামী ও বাবার ভগ্ন পরিবার মেইনটেন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। এই অবস্থায় জন্ম নিল আমার প্রথম সন্তান ছেলে। তাকে নিয়ে সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু বাধা হয়ে দাড়ালো আমার আপন ছোটবোন। সে আমার স্বামীকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করলো।

স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে ছোটবোন খুব সুন্দর করেই সংসার করছে।

স্বামী ও সন্তান হারিয়ে আমি জীবনের গতি খুজে পাচ্ছিলাম না।

অবশেষে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেলাম। শিক্ষকতা করতে ভালোই লাগতে লাগলো এবং পরিচয় ঘটলো বর্তমানে যে স্কুলে শিক্ষকতা করি সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। তার ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু তার কথাবার্তা আমাকে ভাবাতে শুরু করলো। এবং এক সময় তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। কিন্তু তার সংসার, সন্তান থাকায় আমাকে গ্রহণ করতে পারলেন না তিনি।

চলতে চলতে আমার শারীরিক চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তিনি তাই আমার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাকে এক মাঝ বয়সী সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে বিয়ে দেন। তার প্রথমা স্ত্রী তাকে ছেড়ে দিয়ে প্রবাসে পাড়ি জমিয়েছেন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে।

ভাইবোনদের কথা চিন্তা করে বুড়ো লোকটাকেই বিয়ে করলাম শুধুই অর্থের লোভে। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতে লাগলেন। আর আমি একটা কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম এবং তার কাছ থেকে কৌশলে তার সকল সম্পত্তি আমার নামে লিখে নিলাম।

বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হওয়ায় নিজের অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো এবং জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ অনুভবের জন্য বেপরোয়া হয়ে গেলাম। কারণ বুড়ো স্বামী শারীরিক দিক দিয়ে অনেকটা অক্ষম ছিল। এতোটাই উচ্চাভিলাষী হয়ে গেলাম যে, কম বয়সী কোনো ছেলেকে বিয়ে করে সেক্স নিবারণ করার ইচ্ছা জাগলো।

বুয়েট, ইউনিভার্সিটিতে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। পরিচয় হলো বুয়েটের এক ছাত্রের সঙ্গে। তার পড়াশোনার সকল খরাচাদি বহন করতে চাইলাম যাতে সে আমাকে বিয়ে করে।

তারপর সে আমাকে অনুমতি দিল।

আমি অক্ষম স্বামীর অনুমতি নিয়েই তাকে বিয়ে করে একই বাসায় বসবাস করতে লাগলাম। তার রূঢ় আচরণ প্রকাশ পাওয়ায় তাকে ছাড়লাম।

তিন চার বছর পর পরিচয় হলো অমলের সঙ্গে। তাকে নিয়ে আবার বসবাস করতে লাগলাম। তার চরিত্রের বৈষম্য থাকায় তাকে ছাড়লাম।

পুনরায় দীর্ঘ দিন পর পরিচয় হলো তারেকের সঙ্গে। তাকে নিয়ে আবার বসবাস শুরু করলাম ওই অক্ষম স্বামী ও কন্যা সন্তান নিয়েই। অক্ষম স্বামীকে পুতুল স্বামী হিসেবে রেখেছিলাম সমাজের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তারেকের দ্বারা আমি আরেকটা কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম।

কিছু দিন পর পুতুল স্বামী মারা গেলেন। তারেক আমার কাজের বুয়ার সাথে মেলামেশা করার জন্য তাকে ছাড়লাম।

পরিশেষে সোহেলের সঙ্গে বসবাস করছি। তাকে এখন জীবন দিয়ে ভালোবাসি। সে অবশ্য আমার যথেষ্ট ক্ষতিও করছে। তবুও তাকে ছাড়তে পারছি না। সেক্স নিবারণ করতে গিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই। কারণ তারা চায় অর্থ আর আমি চাই সুখ।

বর্তমানে যথেষ্ট সুখে আছি। বড় মেয়ে মেডিকাল, ছোটটা প্রাইমারিতে। আমি পঞ্চাশে পদার্পণ করেছি। জীবনের এতোগুলো ক্ষেত্র ভালোবাসা দিবসে জানাতে পেরে নিজেকে ভারমুক্ত বোধ করছি।

নামহীন

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

অনুভব

– নাজনীন সাহিন

তার ভালোবাসা এবং সে যখন কষ্ট দেয় তাতে দুঃখ পাওয়ার যে অনুভূতি সেটা শুধু অনুভবে, বলার বা ব্যাখা করার ব্যাপার নয়। তবু দেখা যাক না চেষ্টা করে ব্যাখ্যা করা যায় কি না –

তার ভালোবাসা পূর্ণিমার চাদের জ্যোৎস্নায় আগ্রার তাজমহল দেখা।

তার ভালোবাসা বালি, পেনাং কিংবা কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত দেখা।

তার ভালোবাসা হিমেল সকালে নেপালের পোখরায় ফিশটেইল লজ-এর স্বর্গ সদৃশ বাগানের দোলনায় শুয়ে ফিশটেইল পাহাড়ের বরফ ঢাকা চূড়ায় সকালে রোদের খেলা দেখা।

তার ভালোবাসা পাত্তায়ার সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পিডবোটে চড়া।

তার ভালোবাসা গোধূলি লগ্নে সিঙ্গাপুরে ওয়েস্টকোস্ট পার্কের ধারে সমুদ্র তীরে বাতাসের দোলায় দোলা।

তার ভালোবাসা স্বপ্নের শহর ভেনিসের পানির ধারে রুটির লোভে এক ঝাক কবুতরের হাতে এসে বসা।

তার ভালোবাসা আইফেল টাওয়ারের চূড়ায় উঠে প্যারিস নগরী দেখা।

তার ভালোবাসা মালয়শিয়ার জেন্টিং হাইল্যান্ডের শরীর ছুয়ে যাওয়া মেঘের শীতল স্পর্শ।

তার ভালোবাসা ইওরো ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা অস্ট্রিয়ার সবুজ নিঃসর্গের শোভা, পাহাড়ি ঝরনা আর পাহাড়ের নিচে জমে থাকা পানিতে এক ঝাক কিশোরের মাতামাতি।

তার ভালোবাসা টোকিওর ওয়াইলড ব্লু-র ম্যান মেইড সমুদ্রের ঢেউয়ের তোড়ে দড়ি ধরে থাকা নানান বর্ণ ও নানান চেহারার এক দঙ্গল মানুষের পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া এবং পরমুহূর্তেই ভেসে উঠে এ ওর গায়ে অট্টহাসিতে ঢলে পড়া।

তার ভালোবাসা হলিডে ইন-এর স্পৃংয়ের বিছানায় তোলপাড়।

তার ভালোবাসা...।

তার দুঃখ দেয়ার যন্ত্রণা, অতি আপনজনের ভুল বুঝে দূরে সরে যাওয়া, তার সরে যাবার কষ্ট প্রতিনিয়ত শুধু কাদায়।

তার দুঃখ দেয়ার যন্ত্রণা, অতি প্রিয় মায়ের অপঘাতে মৃত্যু, তার মৃত্যুর সময় কাছে না থাকা এবং দূর থেকে কবর খুড়তে দেখে তার বেচে থাকার শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

বোঝাতে কি পারলাম?

বোধ হয় না।

যাদের জীবনে এসব দুর্লভ মুহূর্তগুলো আসেনি তারা কোনোদিনই জানবে না এ ভালোবাসার কিংবা দুঃখ পাবার অনুভূতি কেমন হয়।

ঢাকা থেকে

সত্য

– মুহম্মদ আব্দুল হামিদ

সব মানুষেরই প্রথম যৌবনে প্রেম প্রীতি-ভালোবাসার প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা থাকে। হয়তো আমারও তাই ছিল এবং সেটা একটু বেশিই ছিল।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস! স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি জীবনে কোনো প্রেমময়ী নারীর সান্নিধ্য আমার ঘটেনি। চাকরিতে এসেও বিয়ে করার আগ পর্যন্ত প্রেম অনুসন্ধানে ত্রুটি করিনি। মনে প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অবশেষে বাস্তব প্রয়োজনে বিয়ে করলাম।

যাকে বিয়ে করলাম সে ছিল স্বল্প রূপা, স্বল্প শিক্ষিতা।

অনাধুনিক কিন্তু ভদ্র বংশের। শ্যামলা দেখে বিয়ে করলাম যেন সে কোনোদিন রূপের গর্ব না করে। বিয়েতে যৌতুক নিইনি যেন সে পিতৃ অর্থের বড়াই না করে। উচ্চ শিক্ষিতা দেখিনি যেন সে অত্যাধুনিক না হয়। বড় আশা ছিল, সে যেন ঘরে থেকে সুন্দর করে আমার সংসার গোছায় এবং আমাকে ভালোবাসে, প্রেম করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হলাম। স্ত্রীটি আমার ইঙ্গিত প্রেমের ট্যাবলেট গেলেনি। একমাত্র দ্বিচারিণী হওয়া ছাড়া দাম্পত্য জীবনের এমন কোনো যন্ত্রণা নেই যা সে আমাকে দেয়নি।

সর্বশেষ ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করে আমাকে দুশ্চরিত্র, পরনারীতে আসক্ত বলে। তাও বারো বছর আমার সঙ্গে ঘর করার পর।

একজন পড়শিকে জড়িয়ে বৃথাই আমার দুর্নাম রটিয়ে সুখ বোধ করলো। অথচ ইতিমধ্যে সে আমার দুটি সন্তানের জননী হয়েছে।

মরমে আঘাত পেলাম। তার ওপর প্রতিশোধ নিতে নানানভাবে উদ্যত হলাম। কিন্তু সমাজ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে তাকে করতে না পারলাম ডিভোর্স, না দৈহিক নির্যাতন। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি কোনো অত্যাচারে লিপ্ত হইনি। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, সুযোগ পেলে তাকে মানসিক শাস্তি দেবো ভিন্ন প্রকারে।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো পরকীয়ার প্রচেষ্টায় মত্ত হলাম। নারীর প্রেম লিপ্সায় অর্ধেক জীবন ব্যর্থ করে এবার গোটা নারী জাতির প্রতি ঘৃণা বোধ করতে থাকলাম। ভোগের সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে কোনো নারীকেই ছাড় দেবো না। স্ত্রীর কাছে সগর্বে জানাবো, দেখো, আমি প্রকৃতই চরিত্রহীন হয়েছি, তোমার কথাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি। আশা করি এবার তুমি সুখী হয়েছো, পারো তো আমায় একটু ভালোবাসো।

যাক। এরই মধ্যে হঠাৎ দূরবর্তী একটি জেলায় বদলি হয়ে গেলাম।

গ্রামের বাড়িতে পরিবার রেখে চাকরি রক্ষার্থে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করলাম। বাউন্ডারি ঘেরা মস্তবড় অফিস ক্যাম্পাসের একটি মেসে থাকি। ফ্যামিলি কোয়াটার্সগুলোতে অনেকেই পরিবার নিয়ে থাকেন।

এখানে সহকর্মী একজন মহিলার সঙ্গে শুরু থেকেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি খুব সুন্দরী। জাতিতে হিন্দু। বয়স ত্রিশের কিছু উর্ধে। দুটি সন্তানের মা। দুর্দান্ত চটপটে, সুশিক্ষিতা, আধুনিক, অতি সামাজিক এবং ভদ্র। স্বামী তার চেয়ে কম শিক্ষিত, বেকার, ঘরে বসে সংসার দেখেন।

মহিলাটি অফিসে নিজ দায়িত্ব পালনে দক্ষ। বড় সাহেব থেকে পিয়ন পর্যন্ত সকলেই তার ভক্ত। সদালাপী বলে মহিলাটির সঙ্গ সবাই কামনা করতো।

নবাগত হিসেবে তার গুণগ্রাহীদের একজন হয়ে উঠলাম। তার সঙ্গে কথা বলতে, চলতে ফিরতে অতি ভালো লাগতো।

ব্যক্তি হিসেবে আমার কি গুণ আছে সেসবের সন্ধান আমার স্ত্রী না পেলেও ওই মহিলাটি হয়তো পেয়ে গিয়েছিলেন।

অজ্ঞাত কারণে তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ক্রমেই কমে গিয়ে শুধু আমাতে এসে ঠেকলো।

তিনি আমাকে খুব আপন ভাবতে লাগলেন। প্রতিদিন অফিসের পর তার বাসায়ই আমার অধিক সময় কাটতো। হাসি খুশি, গল্প-গুজব, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খেলাধুলা এসব করে কখন যে গভীর রাত্রি হয়ে যেতো তা টের পেতাম না।

তার স্বামী বিরক্ত হতেন না। তিনিও আমাকে বিশ্বাস করতেন বলে তার স্ত্রীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় বাধা দিতেন না।

মাঝে মধ্যে তাদের স্বামী-স্ত্রীতে প্রচুর দ্বন্দ্ব বেধে যেতো।

মধ্যস্থতা করে যতোদূর পারি মিটিয়ে দিতাম। কিন্তু দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুর মূল কারণ যেদিন জানতে পারলাম সেদিন বড্ড ভড়কে গেলাম।

মহিলাকে একান্তে ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, তার স্বামী তাকে সন্দেহ করেন। প্রতি রাতে তাকে চরিত্রহীন বলে ভর্ৎসনা করেন এবং দৈহিক নির্যাতনও করেন। এমনকি আমাকে নিয়েও নাকি তার দুশ্চিন্তা।

অফিসে কর্তব্যের খাতিরে অনেক পুরুষের সঙ্গে তার চলতে হয়। এসব দেখে তার গাত্রদাহ হয়। বৌ যেহেতু সুন্দরী, তাই তিনি ভাবেন, এই বুঝি গেল।

এভাবেই নাকি গত চার বছর যাবৎ তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাচ্ছেন।

এসব কথা বর্ণনাকালে তিনি আমার সামনে অশ্রুপাত করেছেন। বলেছেন, সবাই বলে আমি ভালো, আমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমাকে শ্রদ্ধা করে অনেকেই। অথচ আমার স্বামীই আমাকে নষ্টা, ভ্রষ্টা, কুলটা, বেশ্যা বলে অহর্নিশ গালি দেয়। আমি সারা জীবন কামাই করে ওকে খাওয়াচ্ছি। বিনিময়ে এটাই কি আমার প্রাপ্য? উত্তরে বলতাম, ম্যাডাম, আপনি যার কাছে দুঃখের কথা বলছেন সেই আমিও আপনার মতোই হতভাগ্য। আমার স্ত্রীও আমাকে একই কথা বলে। আপনার-আমার এই ব্যাধির উপশম বটিকা কি আমার জানা নেই। ঠাট্টা করে বলতাম, এর চেয়ে চলুন, আমরা দুজনে মিলে এক দড়িতে ফাসি নিয়ে ফেলি।

আমার কথার অর্থ না বোঝার মতো অজ্ঞান তিনি নন। তবুও সাহস করে বললাম এ জন্যে যে, জানতাম, এর চেয়ে বেশি কিছু বললেও রাগ না করার মতো সম্পর্কে এরই মধ্যে আমরা পৌছে গেছি।

একদিন কথাচ্ছলে তিনি বললেন, আপনার মতো পুরুষকে যে স্ত্রী ভালোবাসে না, সে নারী জাতির কলঙ্ক।

নীরবে-নিভৃতে এমন অন্তরঙ্গ কথা ছাড়াও আরো যে কতো কথা আমরা বলেছি, শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই।

এক বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে। যেহেতু আমরা উভয়েই বাহ্যত ভালো মানুষ, ভেতরে মানসিক যন্ত্রণায় বিকৃত হলেও একজন আরেকজনকে ভালোবাসি বলে স্পষ্ট করে কেউ বলিনি।

এমন সময় আমার চাকরিতে আবার বদলির আদেশ এলো। আগের কর্মস্থলে আমাকে আবার পোস্টিং দেয়া হলো।

খুশিই হলাম। আবার নিজের বাড়ির কাছে যাচ্ছি। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে, জেদ করে অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম করবো বলে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো নারী যে আমার সঙ্গে প্রকৃত প্রেমে মেতে উঠবে না তা বোঝা হয়ে গেছে।

আমার রিলিজ অর্ডার হবার দুই দিন আগে ওই মহিলা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে অশ্রুভরা নয়ন চোখে বললেন, নিজের বিবেকের কাছ চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবো এই ভেবে শেষ কথাটি বলার জন্যে কাছে ডেকেছি।

কি সে কথা জানতে চাইলে বললেন, দোয়া করি আপনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুখী হোন বাড়ি গিয়ে। তবে এখানে আপনার এমন একজন লোক ছিল, যে আমাকে এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো মনে-প্রাণে-অন্তরে। তাকে আপনি চিনতে পারেননি। সেই ব্যক্তিটি আমি। বিদায় মুহূর্তে এটুকুও যদি আপনি জানতে না পারেন তবে এই অপরাধে সারা জীবন কষ্ট পাবো বলে জানালাম। আমার সুখ তো আপনি দেখেই গেলেন। এই আগুন পোহায়েও যেন মরে মরে বাচতে পারি আশীর্বাদ করবেন।

শুনে হতবাক। মহিলা একি বলেন! তবে কি এ সেই নারী যাকে খুজে বেড়িয়েছি এতোদিন?

পরদিন থেকে পাশা উল্টে গেল। আমি হেড অফিসে দৌড়ে দিয়ে তেল-পানি দিয়ে বদলি ফেরালাম।

এদিকে আমরা দুজন অতি দ্রুত আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেলাম। উভয়ের বয়স পনেরো বছর করে কমে গেল নব্য যুবক-যুবতীর মতো। সামাজিক কটাক্ষ, কলঙ্ক বোধ তোয়াক্কা না করে, যেন তেন প্রকারে নিজেদের মানসিক ও দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে অভিসারে মিলিত হতে লাগলাম।

সে বলতে থাকলো, ভালোবাসায় যে এতো মধু, তোমাকে পূর্ণাঙ্গভাবে পেয়ে এতোদিনে তা বুঝলাম। দেখাই যদি হয়েছিল, বারোটি বছর আগে কেন হলো না?

একদিন বলেছিলাম, শোনো, তুমি-আমি আসলে পাপ করছি। আমরা বৈধ স্বামী-স্ত্রী নই।

সে রেগে গিয়ে বলেছিল, কিসের পাপ?শুধু কলেমা আর মন্ত্র পড়লেই বিয়ে হয় না। তোমার-আমার মনের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার আল্লাহ আর আমার ভগবানের এতে সায় আছে। তোমার স্ত্রী ও আমার স্বামী যে আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, ওদেরটা পাপ না?

দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর যাচ্ছিল। এসব বিষয় চাপা থাকে না। দুজনের চলাফেরা, অপ্রাসঙ্গিক মেলামেশা দেখে তার স্বামীসহ অফিসের সবাই সন্দেহ করতে থাকলো।

সহকর্মীরা এ নিয়ে প্রথম প্রথম হালকা রসিকতা করলেও ক্রমেই ক্ষেপে গেল।

অপদার্থ তার স্বামীটিই শহরের অর্ধেক লোককে তার স্ত্রীর পদস্খলনের কথা জানিয়ে আরাম পেল।

লোকনিন্দায় কর্ণপাত না করে আমাদের নেশায় আমরা মত্তই থাকলাম।

সে তার স্বামীকে বললো, জেনেই যখন ফেলেছো, তাহলে আরো জেনে নাও যে, তাকে ছাড়া আমার চলবে না। এসব দেখে-শুনে ইচ্ছে হয় তুমি থাকো, না হয় যেদিক খুশি চলে যাও।

আমার স্ত্রীকে বাড়িতে গিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, এবার আমি সত্যি সত্যিই লম্পট হয়েছি। পারলে ফেরাও।

আমার স্ত্রী এবং তার স্বামী নরকের আগুনে জ্বলতে লাগলো। আমরা দুজন ঘৃতাহূতি দিয়ে চললাম। ভ্রষ্টা স্ত্রীকে নিয়ে ওর স্বামী এবং দুশ্চরিত্র স্বামীকে নিয়ে আমার স্ত্রী দিন কাটাতে থাকলো নিতান্ত বাধ্য হয়ে।

চারটি বছর পর অবশেষে এক পর্যায়ে আমাদের দুজনের বোধোদয় হলো।

বুঝতে পারলাম আমাদের দুজনের কামনার আগুনে দুটি সংসার ধ্বংস হতে চলেছে।

ইচ্ছা করলেই আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারতাম। সেটা না করে উভয়ে আপোস করলাম। বিচ্ছিন্নতার চুক্তি করে ব্যাকগিয়ার করলাম এবং পরস্পরকে চিরদিন মনে রাখার অঙ্গীকার করে স্বেচ্ছা বিরহ মেনে নিলাম।

এরপর বিশটি বছর কেটে গেছে। আমরা প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে পৌছেছি। দুজনের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে।

আমরা দুজনেই এখন সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। কিন্তু অন্তরের কামনা পরস্পরকে স্মরণ রাখতে বাধ্য করছে এখনো। দুজন দুই জেলায় অনেক দূরে বাস করি। মাঝে মধ্যে দৈবাৎ দেখা হলে স্মৃতির জাবর কাটি, জীবনের সোনালি অধ্যায়ের সেই রঙিন দিনগুলোকে দুই কথা দিয়ে সামনে টানি।

কেন যেন মনে থাকে না, সে আমার স্ত্রী নয়, আমি তার স্বামী নই। শুধু মনে হয়, সে আমাকে এবং আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম কোনোদিন, কোনোকালে। আমি তার প্রেমিক, সে আমার প্রেমিকা।

এটাই সত্য। হোক না তা ঘোর লাম্পট্য বা পরকীয়া!

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অদৃশ্য দেয়াল

– মাহবুব

খুব বেশি সময় নয়, মাত্র দশ বছর আগের কথা।

যতোটা সহজে কথাটা বলা গেল আসলে ততোটা নয়। দশ বছর সময়টা বিশাল একটা সময়। কারণ সে সময় ক্লাস ফোরে পড়ি। ক্লাস ফোরে পড়াকালীন প্রায় সকল স্মৃতিই আমার ভুলে থাকার কথা। হ্যা, সব স্মৃতিই প্রায় ভুলে গেছি। এই ভুলে থাকা স্মৃতির মাঝে কিছু স্মৃতি আছে যা আমার চোখে ভেসে বেড়ায় ধোয়া হয়ে। ধোয়া কিছু স্মৃতির মাঝে একটি স্মৃতি ইদানীং আমার মাথা কামড়ে খাচ্ছে।

আমার বাবা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। জলে ভেসে বেড়ানো কচুরিপানার মতোই আমরাও তেমনি এ দেশটায় ভেসে বেড়িয়েছি। কিশোরগঞ্জ থেকে বাবা বদলি হয়ে তখন কাপ্তাই-এ। বড়ইছড়িতে ছিল আমাদের বাস। বাসার পাশেই স্কুল। ক্লাসে ফার্স্ট গার্লটির নাম ছিল সায়মা। ওই বয়েসে *ভালোবাসা* শব্দটি বোঝার ক্ষমতা কারোরই থাকে না। তবুও কেন যেন সায়মাকে দেখার জন্য আমার মন সর্বক্ষণ উদগ্রীব থাকতো।

স্কুলে গিয়েই সবার আগে আমার কাজ ছিল সায়মা এসেছে কি না তা দেখা। যেদিনই সায়মাকে একা পেতাম সেদিনই তার সঙ্গে বসে অনেকটা সময় গল্প জুড়ে দিতাম। আর যেদিন সে আসতো না সেদিন ক্লাস করতে মোটেও মন চাইতো না।

পড়ায় অমনোযোগী থাকার ফলে ক্যাচিং গ্রু মারমা আর রাখাল দাশ স্যারের কতো যে মার খেয়েছি তার কোনো হিসেবে নেই। আমার সেই ছোট্ট মনের কোণে তবুও সর্বক্ষণই থাকতো সায়মার উপস্থিতি।

এ তো গেল স্কুলের কথা। আমাদের বাসা থেকে সায়মাদের বাসার দূরত্ব ছিল খুবই সামান্য। পাচ মিনিটেই হেটে যাওয়া যেতো। তাদের বাসার সামনেই ছিল একটা শিশুপার্ক। প্রতিদিন বিকেলে সেখানে আমার না গেলেই নয়। এক সঙ্গে সবাই খেলতাম। দোলনায় সায়মাকে বেশির ভাগ সময়ে আমিই দোল খাওয়াতাম। যেদিন তাকে অন্য কেউ দোল খাওয়া তো সেদিন আমার মনটাও খুব খারাপ থাকতো। অনেক সময় অন্যসব বন্ধুদের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়াও হতো।

হঠাৎ একদিন বাবার বদলির অর্ডার হলো। এবার আমাকে চলে যেতেই হবে। তাকে আর দেখতে পাবো না ভেবে কাপ্তাই ছেড়ে চলে যাবার আগের রাতে বালিশে মুখ লুকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে অনেক কেদেছি।

সকালে ওদের বাসায় গেলাম বিদায় নেয়ার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখি ওদের বাসা তালাবন্ধ। চোখের কোণে আবার সেই কান্না নামের জল ঝরতে লাগলো।

চলে এলাম কাপ্তাই ছেড়ে ঢাকায়। প্রথম বেশ কিছু দিন তার জন্য মনটা খুব খারাপ লাগতো। আস্তে আস্তে কবে যে তাকে ভুলে গিয়েছিলাম তা একদম খেয়ালই নেই।

আজ জীবনের এই উনিশ বছর পেরিয়ে এসে প্রেমে পড়লাম মুক্তা নামের একটি মেয়ের। বেশ কয়েকদিন আগে মুক্তাকে ডেকে এমনিতেই কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ একটা সুযোগ পেলাম মুক্তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানানোর। যদিও মুক্তা ব্যাপারটা জানে তবুও মুখ ফুটে কখনো বলা হয়নি। তাছাড়া এখনো তার সঙ্গে তেমন কোনো সম্পর্কও হয়নি।

মুক্তাকে বললাম, একটা কথা তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে বলবো বলবো করে ভাবছি।

মুক্তা বললো, কি?

যখনি বলতে লাগলাম, মুক্তা, আমি তোমাকে...। তুমিই আমার জীবনের প্রথম...

তখনি আমাকে বাধা দিল একটা অদৃশ্য শক্তি। আমার ভেতরের মানুষটা কেন কিংবা কি কারণে যেন বলে উঠলো, মাহবুব, তুই মিথ্যা বলছিস।

তাকে এখন পর্যন্ত বলা হয়নি এই পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ সেই চারটি বর্ণ। ভা..লো..বা..সি।

লাকসাম, কুমিল্লা থেকে

অবুঝ মন

– মাসুদ জাকারিয়া

যাকে নিয়ে এই লেখাটা লিখছি, জানি না সে এখন আমাকে কতোটা ভালোবাসে? তবে আমার বিশ্বাস, সে এখনো হৃদয়ের সমস্ত সত্তা দিয়ে আমাকে ভালোবাসে। আমার এই ভালোবাসার মানুষটির নাম লিজা। সে ছিল আমার খুব কাছের এক বন্ধুর স্ত্রী।

বন্ধুত্বের সুবাদে ওদের বাড়িতে প্রতিদিন চার পাচ ঘন্টা সময় গল্প করে কাটাতাম।

প্রথমে সে আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে খুব কম কথা বলতো এবং খুব সম্মান করতো। কারণ সে ছিল আমার বান্ধবীর ছোট বোন।

আমার বন্ধুটা মনমানসিকতার দিক দিয়ে উদার হলেও সে ছিল রগচটা টাইপের। কথায় কথায় রেগে যেতো। পেশা ব্যবসা হলেও দিন রাতের অধিকাংশ সময় সে আমাদের বন্ধু মহলে ব্যয় করতো। ব্যবসা এবং বৌকে

সময় দেয়ার ব্যাপারে তার ছিল চরম অনীহা। এ জন্য লিজার সঙ্গে তার প্রায়ই ঝগড়া লাগতো এবং শেষ পর্যন্ত অনেক সময় গায়ে হাতও তুলতো।

ওদের প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী ছিলাম আমি। ওরা কিভাবে রাতে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হতো, বন্ধু তা রসিয়ে রসিয়ে আমার কাছে গল্প করতো। বৌকে সময় দেয়ার ব্যাপারে অনীহা থাকলেও দৈহিক মিলনের ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ সজাগ। এসব গল্প আমার কাছে বন্ধু যখন করতো, লিজা তখন লজ্জায় মুখ ঢেকে রাখতো।

বন্ধুটি আড্ডা অথবা ব্যবসার কাজে বাসার বাইরে গেলেও লিজার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে কাটাতাম। ওর সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা আমাকে বলতো।

এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করার ফাকে আমাদের মধ্যে কখন যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

স্বামীর সময় দেয়ার ব্যাপারে অনীহা এবং আমার ঘন্টার পর ঘন্টা তার পেছনে সময় ব্যয় করে তার সমস্ত সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ায় সে আমার প্রতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এর চূড়ান্ত পরিণতি হয়, একদিন আড্ডা থেকে আমরা আসার পর বন্ধু ব্যবসার কাজে দোকানে কেন যায়নি লিজা এটা জিজ্ঞাসা করাতেই বন্ধুটি আমার সামনেই লিজাকে বেদম পেটাতে থাকে।

বন্ধুকে ধরে নিয়ে বাজারে যাই এবং অনেক বোঝাই।

সকালে ওদের বাসায় গিয়ে দেখি লিজার ঠোট কেটে ফুলে গেছে।

বন্ধুটি লিজাকে সরি তো দূরের কথা, ওষুধ পর্যন্ত আনেনি।

ওষুধ কিনে এনে লিজাকে জোর করে খাওয়ালাম।

এই ব্যাপারটাই লিজার মনে প্রচণ্ড আকারে প্রভাব ফেলে। তারপর থেকে সে আমার প্রতি আরো দুর্বল ও ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে।

লিজা ছিল প্রচণ্ড সেক্সি। সে আমাকে বলতো, আপনার কোনো সাহস নেই। আমার বিশেষ লিঙ্গের প্রতি কটাক্ষ করে বলতো, আপনার কোনো ক্ষমতা নেই।

এরই মধ্যে এক শীতের সকালে লিজা আর আমি ওদের খাটে বসে গল্প করছিলাম। লিজা লেপের নিচে শুয়েছিল এবং আমার হাতটা ছিল লেপের মধ্যে। আমার অজান্তে লিজা কখন যে আমার হাতটা তার স্তন-এর ওপর রেখেছিল, প্রথমে টের পাইনি।

হঠাৎ হাতের নিচে নরম কি যেন অনুভব করলাম। সেই সঙ্গে শিরশিরে অন্য ধরনের এক অনুভূতি।

কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর লিজাকে বিদায় জানিয়ে চলে আসি।

কিন্তু আমার শরীর-মন ওই স্পর্শকাতর স্তনের স্পর্শের কথা ভুলতে পারে না।

বিকেলে আবার ওদের বাসায় গেলাম। এক সঙ্গে বসে অনেক গল্প করলাম। ওর দুই চোখ এবং মুখ ছিল ভালো লাগা ভালোবাসায় ভরা।

ওর দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও আমার দুই হাতের মধ্যে নিজেকে সপে দিল।

ওর মুখটা উচু করে ওর ওই কমলার কোয়ার মতো ঠোটকে নিজের ঠোটের মধ্যে টেনে নিলাম।

লিজা প্রচণ্ড ভালো লাগায় আমাকে শক্ত করে আকড়ে ধরলো। এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। এক সময় স্বাভাবিক হলাম। আবার শুরু হলো গল্প।

আস্তে আস্তে লিজার প্রেমে ধরা পড়লাম। প্রচণ্ড ভালোবাসতে লাগলাম ওকে। একদিন লিজাকে না দেখলে আমার চোখের ঘুম হারাম হয়ে যেতো। কিন্তু ওকে তেমন বুঝতে দিতাম না। এভাবে দিনের পর দিন ভালোই চলছিল।

একদিন রাত দশটার দিকে ওদের বাসায় গেলাম। বন্ধু বাসায় ছিল না।

লিজা আমাকে বসতে বললো।

কিছুক্ষণ ওর হাত ধরে গল্প করার পর লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেক্সে ওর চোখ দুটি লাল হয়ে গেছে।

ও উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দুই হাত দিয়ে তাকে গ্রহণ করার জন্য আমাকে আহ্বান করলো।

আমি ওর আহ্বানে সাড়া দিতেই ও প্রচণ্ড বেগে আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

আমরা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গিয়ে পরম ভালোবাসায় দুজন দুজনকে গ্রহণ করলাম।

এভাবে কিছু দিন চলার পর হঠাৎ করে ঢাকায় চলে যাই। ঢাকা যাওয়ার আগে আমার অভিমানীর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। লিজার চোখে ছিল শুধু পানি আর প্রিয়জন হারানোর বেদনা।

ঢাকায় গিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত তার ভালোবাসা আমাকে কুড়ে কুড়ে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমার এ হৃদয় ও মনের প্রতিটি কণা লিজা তার ভালোবাসার দাম দিয়ে কিনে নিয়েছে। কিছুতেই একটা মুহূর্তের জন্যও তাকে মন থেকে সরাতে পারছিলাম না। বার বার তার চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। লিজা দূরে থাকায় বুঝতে পারি সে আমার জীবনে কতোখানি প্রভাব ফেলেছে।

হঠাৎ একদিন সে আমাকে মোবাইলে ফোন করে।

আমার তখন মনে হলো, এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি। আমার ভালো লাগা, আমার ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কিছুতেই সবার সামনে চেপে রাখতে পারছিলাম না।

আন্টি এবং কাজিনরা জিজ্ঞাসা করে, দিন–রাত মন–মরা হয়ে বসে থাকিস। হঠাৎ কার ফোন এলো যার জন্য তোকে এতো খুশি দেখাচ্ছে?

আমি এটা ওটা বলে চেপে যাই।

লিজার টানে আবার বিশ বাইশ দিন পর পর বাসায় আসতে থাকি। বাসায় ব্যাগটা ফেলেই রেখেই চলে যেতাম আমার অতি প্রিয়, অতি ভালোবাসার মানুষটির কাছে।

সে আমাকে কথা, ভালোবাসা এবং চুমোয় চুমোয় ভরে দিতো আমার সারা শরীর ও মন।

লিজার ভালোবাসার পরশ নিয়ে আবার ঢাকা চলে যেতাম। রাতে শুয়ে শুয়ে তার কথা চিন্তা করতাম এবং ভাবতাম! এভাবে আর কতো দিন, সে ছিল বিবাহিত এবং আমি অবিবাহিত। আমার পরিবার তাকে কোনোদিন মেনে নেবে না। অনেক চিন্তা করে দেখলাম, এভাবে চললে এর ফলাফল হবে ভয়াবহ। আমাদের এ সমাজ দুজনার জীবনকেই বিষিয়ে তুলবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে যতোটুকু সম্পর্ক রাখা দরকার, তার সঙ্গে সেই সম্পর্কটুকুই রাখবো।

তাকে বোঝাতে শুরু করলাম।

সে কিছুতেই বুঝতে চাইতো না। আমার অভিমানীর চোখ দিয়ে শুধু অঝোরে অশ্রু ঝরতো। এসব কথা বললে পাগলের মতো আচরণ করতো এবং কান্নাকাটি করতো।

মনকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করে ঢাকায় থাকা শুরু করলাম। দুই মাস পর বাসায় গেলেও ওদের বাসায় যেতাম না। বুঝতাম ও প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। তবুও দুজনার (নাকি আমার) ভালোর জন্য এক বুক কষ্ট নিয়ে ওকে এভয়েট করতে থাকি।

এভাবে কয়েক মাস চলার পর আমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে হঠাৎ করে ছুটে যাই আমার ভালোবাসা লিজার কাছে।

ও আমাকে বসতে বললো।

কিন্তু ওর চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো যেন হাজার পাওয়ারের ইলেকট্রিক শক খেয়েছি।

লিজার চোখ মুখ অতি স্বাভাবিক। যে চোখ মুখ আমাকে দেখলে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে ভরে যেতো, আমার সান্নিধ্যে যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে মনে হতো সেই লিজা আজ অতি নীরব। সে হয়তো আমার কথা মতো বাস্তবতা মেনে নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছে।

আমিও দোয়া করি, তুমি, স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে দিন যাপন করো। তুমি সুখে থাকলে নিজেকে একটু হলেও সুখী ভাববো। আমিও ভালো থাকার চেষ্টা করছি। তোমার ওই স্বাভাবিক আচরণ আমাকে প্রতিটি মুহূর্ত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তোমার এ অবহেলায় আমার এ হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। এর জন্য তো তুমি দায়ী না। দায়ী আমিই। তাই মনকে বলি, হায়রে অবুঝ মন! যখন সে তোর জন্য পাগল ছিল তখন তুই তাকে চাইলি না। আজ যখন সে নীরব তখন তুই তার জন্য পাগল হলি।

পাগল এই মনটা নিয়ে ঈদের দিন সকালে গেলাম লিজার কাছে।

আমাকে দেখে লিজা একটু হলেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো।

অনেক দিন পর নিজেকে একটু সুখী বলে মনে হচ্ছিল।

বিকেলে ওর বাসায় গিয়ে শুনি সারাটা দিন ও কেঁদেছে শুধু আমার জন্য।

লিজা, এ পৃথিবীতে যতো দিন বাচবো, যতো দূরেই থাকি না কেন, আমার এ হৃদয়ের ভালোবাসা তোমার প্রতি সব সময় থাকবে। আমার ভালোবাসাটা তোমার দেহের দিকে নয়, মনের দিকে। তোমাকে একটু দেখা বা তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা আমার মনে হয় এ পৃথিবীতে স্বর্গ পাওয়া। তোমাকে যে কি পরিমাণ ভালোবাসি তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তুমি প্রকাশ করতে পারো আর আমি পারি না, এই যা পার্থক্য।

কাছে অথবা দূরে যেখানেই থাকি না কেন যদি তোমার কোনো প্রয়োজন হয়, আমাকে মনে করো। দেখবে, তোমার ভালোবাসা শত বাধা অতিক্রম করে তোমার দুয়ারে উপস্থিত।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

রাঙা বৌ

আমার প্রাণ প্রিয় রাঙা বৌ। আমার প্রাণ পাখি। ভালোবাসা কাকে বলে তা জানি না। তবে যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেদিন থেকে এক লোকমা ভাত শান্তিতে খেতে পারিনি। নামাজের সেজদা ঠিকমতো দিতে পারিনি। পড়ার টেবিলে কখনো মন বসাতে পারিনি। সারাক্ষণ মনে পড়েছে তোমার কথা। তুমি পারতে তোমার সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়ে আমাকে অনেক উচুতে পৌছে দিতে। অথচ তোমাকে ভালোবেসে ভুলে গেছি নিজের কথা।

কখনো কল্পনা করিনি তুমি কে, আমি কে, তুমি কোথায়, আমি কোথায়? সম্ভব-অসম্ভবের কথা। তোমার মোহে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। তোমাকে নিয়ে রচনা করেছি অজস্র গল্প, কবিতা, গান। তুমি ছিলে আমার একমাত্র স্বপ্ন। সে স্বপ্ন আমার ভেঙে গেল। তোমাকে বুকে নিয়ে একটু শান্তি পেতে চেয়েছিলাম। শান্তি খুজেছি তোমার বুকে। সত্য খুজে পেতে চেয়েছি তোমার ভেতরে। আমার যৌবনের সঞ্চিত ভালোবাসা সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি তোমাকে।

যেদিন থেকে তোমাকে আমি ভালোবেসেছি সেদিন থেকে আমার জান, আমার প্রাণ, আমার রুহ চলে গেছে তোমার ভেতরে। দুটি আত্মা মিলে হয়েছি এক আত্মা। আমার প্রাণটা সব সময় থাকে তোমার ভেতরে। তাই তো তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একটি পশম খসে পড়লেও তা টের পাই, হৃদয়ে ব্যথা পাই।

মনে হয় তোমার প্রতিটি অঙ্গই যেন আমার অঙ্গ। কেউ তোমাকে স্পর্শ করলে বা তোমার সাথে কথা বললে তা আমার সহ্য হয় না।

তোমাকে এতো বেশি ভালোবেসেছি যে, কেউ যদি রুটি খাওয়ার জন্য আমার শরীর থেকে প্রতিদিন এক টুকরা করে গোস্ত চায়, তাও কেটে দিতে রাজি। কেউ যদি বলে সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর আমার রাঙা বৌ একদিকে, আমি কাকে নেবো? আমি বলবো, আমার রাঙা বৌকে চাই। আমার রাঙা বৌয়ের ভালোবাসা চাই।

আমার রাঙা বৌ এতোই সুন্দরী যেন আধার ঘরের আলোকিত চাদ। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গ এতো ভালো লাগতো যেন স্বর্গ খুজে পেয়েছি ওখানে। ওখানেই যেন আমার স্বর্গ। তার মুখে যেন যাদু। কি পরিমাণ যে মিষ্টি মধু তার মুখে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তা একমাত্র তিনিই জানেন।

আমার রাঙা বৌ খুব ভালো মানুষ। তার মনটা আকাশের মতো বিশাল। সে বিশাল আকাশে যে কেউ অনায়াসেই প্রবেশ করতে পারে। তখন আর আমার কথা মনে থাকে না।

যখন আমি লক্ষ্য করলাম আমার রাঙা বৌয়ের কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, তার পক্ষে যেটা সম্ভব তা দিতেও অনীহা প্রকাশ করে, সে যা দিতে পারে তা দিতেও কার্পণ্য করে। আরো অনেক কিছুতে যখন অমিল দেখি, দেখি যখন তার অন্য রকম আচরণ তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, আমার রাঙা বৌ আমাকে কি পরিমাণ ভালোবাসে, কিভাবে ভালোবাসে।

আমার রাঙা বৌ আমাকে এতো বেশি ভালোবাসে যে, তার ভালোবাসার আঘাতে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমার রাঙা বৌ আমাকে এতো বেশি ভালোবাসে যে, সে ভালোবাসার ভার সইতে পারি না। তাই হয়তো একদিন না বলেই চলে যাবো তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে। তোমার বিশাল আকাশের মতো মনের মাঝখান থেকে একজন চলে গেলে হয়তো মনেও পড়বে না কে চলে গেল।

অবশেষে তুমি যে আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে তা হয়তো পূরণ করতে পারিনি। তাই তোমার অন্যত্র আনাগোনা। দোয়া করি এখন যে তোমার জীবনে আসবে বলে আমার সঙ্গে সেপারেশন সে যেন তোমার সকল আশা পূরণ করে দেয়। আল্লাহ যেন তোমার সকল মনোবাসনা পূরণ করে দেয়।

ছোটবেলা থেকে তুমি লালিত পালিত হয়েছো শান-শওকত বিলাসিতায়। কষ্ট কি তা কখনো বোঝোনি। একমাত্র ভালোবাসার টানেই তুমি তোমার বাবার বিলাসবহুল বাড়ি থেকে যেদিন সকল বাধাবিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে চরম আত্মবিশ্বাসে চলে এসেছিলে আমার খড়ের ক্ষুদ্র কুটিরে সেদিন মনে হয়েছিল, আকাশ থেকে এক ফালি চাদ এসে আমার কুড়ে ঘরকে আলোকিত করেছে। স্বর্গ নেমে এসেছে আমার কুড়ে ঘরে। আজ সে ঘরকে আধার করে দিয়ে চলে যেতে চাচ্ছো! যে ভালোবাসার টানে একদিন তুমি সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছিলে সে ভালোবাসা আজ তোমার কাছে তুচ্ছ। অর্থ-সম্পদই তোমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে!

তুমি নিজ চোখেই দেখেছো একমাত্র তোমার সুখের জন্য আমার সর্বস্ব ব্যয় করেছি। তারপরও তোমাকে ধরে রাখতে পারলাম না। *অভাব যখন দরজায় এসে দাড়ায়, ভালবাসা তখন জালানা দিয়ে পালায়।* এ স্বতঃসিদ্ধ সত্যটাকে মেনে তোমার সুখের জন্য তোমার সিদ্ধান্তটাকেই মেনে নিলাম শত কষ্টের মাঝেও। তবে একটি কথা মনে রেখো, তুমি যে ভালোবাসার টানে এসেছিলে সে ভালোবাসার কমতি আজও নেই। হয়তো দারিদ্রের কষাঘাতে তোমার সব আবদার রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু তোমার একই কথা, *আবেগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আর যাই হোক পেট চলে না।* আজ তোমাকে দিয়ে উপলব্ধি করেছি অর্থের কাছে প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসা সবই তুচ্ছ।

তুমি যে সুখের সন্ধানে ছুটছো সে সুখের নাগাল যেন পাও। তবে এ তিন বছরের দাম্পত্য জীবনে অনেক মান অভিমান হয়েছে। তোমাকে অনেক বকেছি, অনেক জ্বালাতন করেছি, অনেক কষ্ট দিয়েছি, নিজেও অনেক কষ্ট

পেয়েছি। এটা ছিল আমার ভুল। না বুঝে এ ভুলগুলো করেছি। আজ ভালোবাসা দিবসে তোমার কাছে অনুরোধ আমার এ ভুলগুলো, এ অন্যায়গুলো ক্ষমা করে দিও।

ইতি – তোমার **দুষ্ট** (অতীত)
ঢাকা থেকে

কাটা ভরা গাছ

- আলী ইবনে ওয়াদুদ

ভালোবাসা কাকে বলে কতো প্রকার ও কি কি? ভালোবাসা নামের অনুভূতিটা কোন জাতীয় দাড়িপাল্লা বা নিক্তিতে মাপা যায়? এ ধরনের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পাঠ্য বইয়ে নেই। অভিধানে প্রতিশব্দ থাকলেও প্রচুর ব্যাখ্যা নেই। ভালোবাসার উৎপত্তিস্থল, বিচরণ ক্ষেত্র, পরিধি পরিব্যক্তি, সময় উপযোগিতা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাইনি। কবিদের কাব্যিক ছন্দে, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে জানা যায়, ভালো লাগা থেকে ভালোবাসার উৎপত্তি হয়। ক্ষেত্র বিশেষে আনন্দ বা বেদনায় পরিব্যপ্তি ঘটে। পাওয়া বা না পাওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।
আমি গোবেচারা টাইপের এক অধম। তবু আমার বিন্দুসম জ্ঞান ও বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেছি বহুবার। অকাট মূর্খ বিবেক ভালোবাসার সংজ্ঞা দেয় নিম্নরূপ :

এক. মায়ের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধার। *দুই.* বৌয়ের প্রতি ভালোবাসা প্রণয়ের। *তিন.* সন্তানের প্রতি ভালোবাসা স্নেহের। *চার.* বন্ধু মহলের প্রতি ভালোবাসা শুভেচ্ছা ও প্রীতি বিনিময়ের।
আমার অতি পণ্ডিতি ভাবের বৌটিকে এ ধরনের কোচিং দিয়েছি তিনশ সত্তরবার। বুঝিয়েছি সাতশ নব্বইবার। হৃদয়ঙ্গম করতে বলেছি নয়শ নিরানব্বইবার। কিন্তু আমার কোচিং ফেল, গুরুগিরি ব্যর্থ।
সে সব সময় বলে, সব ভালোবাসা তোমার আগের বৌ নিয়ে গেছে। আমি পেয়েছি ছোবড়া। ছোবড়ার যা ছিল তা পেয়েছে তোমার মেয়েটা। অমন আহ্লাদে মেয়ে পৃথিবীতে আর কারো নেই। হারামি মেয়েটা তোকে জাদু করেছে?
বলুন, এর ওষুধ কি? আমার অপরাধ কোথায়? গণ্ডগোলের উৎস কোথায়? কোথায় সেই অঘটনের অশুভ গন্ধ? দয়া করে শুনুন পরের নিরর্থক ব্যথাময় পাণ্ডুলিপিটি।

এক. প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামে এই অধমের জন্ম। কোন কুক্ষণে কি কি কুলক্ষণ নিয়ে জন্মেছিলাম তা আমার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীই বলতে পারেন। কি কুফা জাতীয় ঘটনা ঘটেছিল তা তাদেরই জানা। বোধের বয়স থেকে দারুন অভাবে পড়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে ক্লাস এইট থেকে বাড়ি থেকে পাচ কিলোমিটার দূরে জায়গীর নামের কারাগারে সশ্রম কারাদণ্ড হলো।
এক বছরে তিনবার লজিং বদলাতে হলো। কারণ আমি কুড়ে গরু, হালে ভালো টানি না। কেননা বাচ্চাদের পড়ালেও আমি ছিলাম হাফ মাস্টার হাফ কামলা। ছেলেমেয়ে জনাপাচেক পড়িয়েও আমাকে মাঝে মধ্যে ধান ভানা ও পানি আনা জাতীয় কাজটি করতে হতো। এটাকে ভাগ্য মনে করে মেনে নিয়ে চলছিলাম।
এক পর্যায়ে এক চাকরিজীবী ভদ্রলোকের বাড়িতে স্থান পেয়ে গেলাম। চারটি অমনোযোগী বাচ্চাদের পড়িয়ে তারপর নিজের পড়া, বিনিময় তিনবেলা উদর পূর্তির ব্যবস্থা।
এভাবে কেটে গেল এসএসসি ও এইচএসসি–র পড়াশোনা। তবুও যেন সৃষ্টিকর্তার অপার দয়ায় পরীক্ষা নামের খেয়াটা সহজেই পার হলাম।
একদিন হাতে মাত্র একশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে মা গাড়ি ভাড়ার টিকেটসহ এলাকায় বড় ভাইয়ের মাধ্যমে আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য কামাই করে অলস ও বৃদ্ধ পিতা, গর্ভধারিণী মাতাসহ পাচজনের পরিবারের রুটিরুজির ব্যবস্থা করা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভর্তির টাকা কোথায়? আবারও লজিং মাস্টার হলাম। তাছাড়া মাথা গোজার ঠাই যে নেই!

অবশেষে লেখাপড়ার অবসান ঘটিয়ে চাকরি নামের সোনার হরিণের পিছে ছুটতে ছুটতে যখন জুতার তলায় আর মাংস নেই, হাটতে হাটতে যখন হাটু ধরে এসেছে, ইন্টারভিউ দিতে দিতে যখন পঞ্চাশ পঞ্চান্নটির মতো কার্ড জমা হয়েছে সেই সময় করুণানিধি দয়াময় আল্লাহর দয়া হলো। আইএ পাস থাকায় কেরানি পদমর্যাদার সামাজিক গুরুভার বহনের দায়িত্ব পেলাম মফস্বল শহর মেহেরপুরে। অভাগার সামনে প্রেম নামের বস্তুটি অদৃশ্য রয়ে গেল।

জীবনের প্রথম চাকরি কেরানিগিরি। বেতন সাতশ = চোদ্দশ পনেরো টাকার স্কেলে। সর্বমোট এগারোশ পচিশ টাকা। বেতন পাওয়ার আগেই বাড়ি থেকে চিঠি এলো টাকা পাঠাও।

বাড়িতে বাবা ও ভাই যা একটু কাজ করতেন সংসারের আমার চাকরির খবরে হাত পা ধুয়ে ক্ষেত থেকে ঘরে উঠে বসলেন। বাড়ির দরকার মাসে দুই হাজার টাকা। আমি বেতন পাই এগারোশ পচিশ টাকা। খাই কি, আর বাড়িতে পাঠাই কি!

ছয় মাস পর আবারও জনৈক হাজি সাহেবের বাড়িতে দুবেলা গুরুগিরির পরিবর্তে তিনবেলা গেলার ব্যবস্থা হলো। বেকার থাকার অসহায়ত্ব ঘুচলো বটে, কষ্টের দিনগুলোর শুরু হলো নতুন করে। এর মাঝে প্রেম এলো। বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। বাবা মা ভাই বোন কেউ রাজি হলো না।

অনেক সংগ্রাম আর সাহসী মোকাবেলায় বাবা মাকে রাজি করিয়ে কুমারত্বের অবসান ঘটালাম। কিন্তু অভাব আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে স্বপ্ন বাসরে প্রবেশ করলো।

বেতন একটু বেড়ে ষোলশ টাকা হলো।

বিয়ের পরেরদিনই বৌকে পাচ বছর শ্বশুর বাড়িতে রেখে পড়ানোর অঙ্গীকার শ্বশুরপক্ষ ভুলে গেল। আমাকেই কাধে করতে হলো বৌ নামে নতুন বোঝাটাকে। ষোলশ টাকা বেতন পেয়ে বাসা ভাড়া দিই চারশ টাকা। বাড়ি পাঠাই পাচশ টাকা। বিদ্যুৎ বিল দিই একশ টাকা। তাহলে আমরা দুজন কি খাই? এ রকম অবস্থায় আমার ভালোবাসার পালানোর জন্য জানালা না খুজে দরজা দিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম হলো। বাধ্য হলাম টিউশনি শুরু করতে।

ইংরেজি ভালো জানা ছিল। সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম করি যার বিনিময়ে তিনবেলা দুজনার অন্ন সংস্থান হয়। অভাব নামের কাটাময় বিষ বৃক্ষের যন্ত্রণায় যখন আমার সংসার জর্জরিত তখনই ভালোবাসা নামের বস্তুটা সংসারের জানালা না খুলে দরজা দিয়েই তার পথ খুজে পেল।

চরম ভালোবাসার সংসারে অশান্তি দেখা দিল। বাবা মা সহ্য করতে পারেন না শ্বশুর-শাশুড়ির আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া। আবার শ্বশুর শাশুড়ি তাদের একমাত্র মেয়েকে ঘরজামাই ছাড়া আমার কাছে দিতে অস্বীকার করলেন। দুই পরিবারের রেষারেষিতে বৌ একবার আমার সঙ্গে পালিয়ে গেল নতুন কর্মস্থল রাজশাহীতে।

ইতিমধ্যে প্রথম সন্তানের বাবা হয়েছি। বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ির মাঝে চলমান যুদ্ধে আপাতত সন্ধি হলো। কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি চললো। গ্রামের বাড়িতে ১৯৯৬ সালের ঈদে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি বৌকে নিতে এলেন। মিথ্যা কথা বললেন যে, আমি বৌকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

কিন্তু বাবা-মা ও ভাই-বোন তাদেরকে খারাপ ব্যবহার করে ফিরিয়ে দিলেন। ফলে ঈদ পরবর্তী দিনগুলোতে যখন নওগা বসবাস করছিলাম তখনই আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, চাচাশ্বশুর, চাচি শাশুড়িসহ এক ব্যাটালিয়ন লোক ঝটিকা অভিযানে আমার বাসায় এলেন। আমার বৌকে আমার মতো জড় পদার্থের হাত থেকে উদ্ধার করতে।

তাদের বোঝালাম, অনুরোধ করলাম, বৌকে বোঝালাম এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা আমার দুই বছরের পুত্র ও স্ত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আমার নামে যৌতুকের মামলা হলো। আগেই বলেছি, আমার স্ত্রীর একে তো বয়স কম, তার ওপর ক্লাস ফাইভ পাস। তার বাবা যা বোঝালেন তাই বুঝলো। আমার কথা চিন্তা করলো না বা তার একমাত্র পুত্রের কথাও না।

মামলা চলতে থাকাকালে পিতার অতি উৎসাহে পরকীয়া প্রেমে মগ্ন হলো তার বাবার জেলার এক সন্ত্রাসীর সঙ্গে। এক সময় আমার বাচ্চাকে তার বাবার বাড়িতে রেখে তার প্রেমিক মহোদয়ের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল।

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। সকালবেলা সন্তানের খোজ নিতে টেলিফোন করে খবরটি পেয়ে গেলাম। কেদে-কেটে একাকার হলাম। হায়রে আমার প্রথম জীবনের প্রথম প্রেমের বিয়ে করা বৌ!

এর কিছু দিন পর শ্বশুর বাবাজি নতুন লিভিং টুগেদাররত জামাইবাবুর সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ও আমার সঙ্গে তালাকের পর্বটি একই সঙ্গে একই দিনে শেষ করলেন। ভেঙ্গে গেল আমাদের পাচ বছরের সংসার। পিতৃহারা হলো আমার একমাত্র পুত্র আশিকুর রহমান।

দুই. স্ত্রী-পুত্রহারা নির্জীব জীবনে যখন একে একে তিনটা বছর পার করে দিলাম, অসহায় জীবন আর সহ্য হচ্ছিল না। একমাত্র পুত্রের মুখখানা তিন বছর দেখি না। ফরিদপুর শহরে তার মাস্তান স্বামীর দাপটে কোন সাহসে ছেলেকে দেখতে যাই! পুলিশের বড় বড় দুই কর্তার সাহায্য চাইলাম। ব্যর্থ হলাম। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, কমিশনারসহ পৌর চেয়ারম্যানের শরণাপন্ন হলাম। কাজ হলো না। ছেলেকে দেখতে চাইলেও পারলাম না।

বুকে পাষাণ বেধে আবারও পিতা মাতার পরামর্শে বিয়ের পিড়িতে বসলাম। কিন্তু কথায় বলে, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়। সুখ ও ভালোবাসা আমার কপালে সইলো না। যদিও স্ত্রী আমায় খুবই ভালোবাসতো এবং নিজের জীবন থেকেও আমাকে বেশি গুরুত্ব দিতো।

এর মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম কন্যা সন্তানের বাবা হলাম। আনন্দ ও সুখ সাগরে ভাসতে লাগলাম। স্ত্রী, কন্যা নিয়ে নতুন এক চাকরিতে নতুন জেলায় পোস্টিং নিয়ে চলে এলাম। বছর না ঘুরতেই আমার স্ত্রী আবার মা হতে চললো।

২০০২ সালের ১৬ জানুয়ারি বিকাল তিনটার সময় তার দ্বিতীয় সন্তান পুত্র সন্তানের মা হলো এবং ওই দিনই রাত ৮টায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে হাসপাতালে মারা গেল। আমি তখন তার কাছে থাকতে পারিনি। কর্মস্থলে ছিলাম।

একদিনের শিশু-পুত্রকে রেখে স্ত্রী চলে গেলে এক কন্যা দুই বছর ও এক পুত্র একদিনকে নিয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর শোকে পাথর হয়ে গেলাম। দুইটি বাচ্চার কিভাবে, কোথায়, কাকে দিয়ে মানুষ করবো সেই ভাবনায় অস্থির।

দুটি মাস স্ত্রীর কথা মনে করে ঘুমাতে পারিনি। আমার সারা অঙ্গে তার অঙ্গের সুবাস জড়িত বলে মনে হতো।

ছোট বোনের সহৃদয় সাহায্য সহযোগিতায় আমার একদিনের শিশুপুত্র সুস্থ হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে মাতৃহারা এই অবুঝ শিশুর দিকে একবার তাকিয়ে এলাকায় সর্বস্তরের মানুষ আল্লাহর কাছে আচল তুলে দোয়া করলো।

বোনের সংসারে অশান্তি দেখা দিল। তার স্বামী তাকে কাছে পায় না, সে আমার বাসায় আমার বাচ্চাদের নিয়ে থাকে। তার সংসারে ঝড় উঠলো। সেও বাধ্য হলো বিয়ে নামের চিরদণ্ডে আমাকে দণ্ডিত হওয়ার পরামর্শ দিতে।

তিন. সেজ বোনের দেখা ও পছন্দের পাত্রীকে তৃতীয়বারের মতো বিয়ে করলাম। আমার এতিম দুটা বাচ্চাকে লালন পালনের ভার দিলাম তার হাতে। কথায় বলে, *শান্তির পর পরই অশান্তি আসে*। আমার বাচ্চারা আমার স্ত্রীর কাছে শেয়াল-কুকুর হয়ে গেল।

একমাত্র মেয়েটাকে বেশি ভালোবাসি। এই অপরাধে একশ সত্তরবার মেয়েকে আমার কাছে শেয়ালো, অথচ আমার মেয়েটা চার বছরের শিশু। সে বলে, ছেলেটা মাকে খেয়েছে, মেয়েটা তোকে খাবে। এ ধরনের বক্তব্যসহ সারা রাত, সারা দিন ওই দুই বাচ্চার কবর খোড়ে, কাফনের কাপড় পরায়।

মাঝে মধ্যে ভাবি, আমি মানুষ, না আগুন, না পাথর? মানুষ হলে আমার এতো দুঃখ-কষ্ট সহ্য হয় কিভাবে? এর মধ্যে বর্তমান স্ত্রীরও এক পুত্রের জন্ম হলো। তার শিকড় আরো প্রোথিত হলো আমার সংসারে। তার অত্যাচারে বাধ্য হলাম চার বছরের মেয়ে ও দুই বছরের ছেলেকে বাসা থেকে সরিয়ে আবারও বাবা মায়ের কাছেও ছোট বোনের কাছে রেখে আসতে।

স্ত্রী চায় না আমার প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় স্ত্রীর এক কন্যা ও এক পুত্রের কথা মনে রাখি। তাদের খোজখবর নিই বা টাকা পাঠাই। এতিম বাচ্চাদের বাড়ি পাঠিয়েও তার ঝগড়া, চেচামেচি ও অকথ্য ভাষার মহা মূল্যবান বাণী থেকে রেহাই পাই না। অথচ আমার সর্বশেষ সন্তানটি (দেড় বছর) আপা ও ভাইয়া ভাইয়া করে কাদে।

ভালোবাসা নামের বস্তুটি আমার জীবনে অভিশাপ। ভালোবাসাহীন জীবনটাকে ও হৃদয়হীন স্ত্রীকে নিয়ে, কতোদিন এভাবে যন্ত্রণাময় বিষ বৃক্ষের উপর দিয়ে আমার এ নগ্ন পদযাত্রা? কতো দিন চলবে কে জানে? কোথায় শেষ হবে কে বলবে? ভালোবাসা আর চাই না। এখন জীবন থেকে নিষ্কৃতি চাই।

বগুড়া থেকে

বংশধরের জন্মদিন

- ঝলক

সামরিক কর্মকর্তা, সেই সঙ্গে একক এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় ব্যস্ততায় দিন কেটে যাচ্ছিল। তাই ভালোবাসা দিবস মানেই ছিল যাযাদির বিশেষ সংখ্যার পাঠক করে নিজেকে অন্যদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। সেই আমার জীবনেও ভালোবাসা এসে যায় একেবারে হঠাৎ করেই। পরিবারের আপনজনদের মাঝে হঠাৎ করেই লক্ষ্য করলাম আমাকে নিয়ে অধিক ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। ঠিক এ সময়ই বাড়ি থেকে আদেশ এলো কয়েকদিনের ছুটি নেয়ার।

আমার অনুপস্থিতিতেই কনে বাছাই চূড়ান্ত হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে অর্থাৎ বছরের বড় দিনে সকলের গৃন সিগনাল পেয়ে এনগেজমেন্টের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে একেবারে রেজিস্ট্রিসহ বিয়ে হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল জীবনের একেবারে নতুন এক অধ্যায়ের।

বাসরঘরেই প্রথম দুজনের একান্তে কথাবার্তা হলো। সারা দিনের ক্লান্তিতে আমার নববধূ আমার সম্মতিতেই মাঝরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল যা নিয়ে পরবর্তীকালে এখন পর্যন্ত তাকে অনুশোচনা করতে দেখা যায়। আমার সেই ভালোবাসার মানুষকে সারা রাত নিবিষ্ট মনে দেখতে থাকলাম ভবিষ্যতের সুখ কল্পনায়।

খুব ভোরে নববধূ চোখ খুলে দেখতে পায় ঘুমহীন চোখে অপলক তার দিকেই তাকিয়ে আছি। সঙ্গে সঙ্গেই আবেগ আপ্লুত হয়ে সে নিজেকে আমার বুকের মাঝে পরম নির্ভরতার সঙ্গে সমর্পণ করে দেয়।

এর সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হয় আমার জীবনের ভালোবাসা গল্পের সূচনা পর্বের। আস্তে আস্তে পেতে শুরু করলাম ভালোবাসার বৈধ এবং পবিত্র রূপ, রস, গন্ধ।

জীবনের বিভিন্ন সময় যখন বন্ধু-বান্ধব, কোর্সমেট এবং সহপাঠীদের ভালোবাসার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনতাম তখন তাদের প্রতি মনের অজান্তে হিংসা হতো যে, তারা কতো ভাগ্যবান! কিন্তু বর্তমানে যখন দেখতে পাই ব্যক্তি জীবনে তাদের অধিকাংশই সফল হয়নি তাদের সেই ভালোবাসাকে পূর্ণতা দেয়ার ক্ষেত্রে তখন

নিজেকেই অধিক সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়। কারণ এতো দিনে জেনে গেছি যে, আমাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসার মতো একজন রয়েছে। সে আমার স্ত্রী প্রমি।

তার সকল আবদার, অভিমান, ছেলেমানুষি সব যেন আমাকে ঘিরেই। তাই তো যতোক্ষণ এক সঙ্গে থাকি আমাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। এমনকি আমার কথা চিন্তা করে নিশ্চিন্তে নিজের পড়াশোনার ক্ষতি করতেও তার এতোটুকু দ্বিধা হয় না।

কর্তব্যের খাতিরে অনেক সময়ই আমাকে দূরে থাকতে হয়। তখন বুঝতে পারি, প্রমি আমার জীবনের কতোটুকু পরিমাণ জুড়ে আছে। সারাক্ষণই মন পড়ে থাকে তার কাছে। আমি জানি ঠিক এমনটিই ঘটছে তার মাঝেও।

আজ যখন এই লেখাটি লিখছি তখন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘাঘরা নামের একটি ক্যাম্পে। কিন্তু আমার মনটা পড়ে আছে ঠিক তার কাছে। কয়েকটা দিন পরেই আমাদের দ্বিতীয় বিয়েবার্ষিকী। আমি এখন সেই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।

মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে ইনশাআল্লাহ জীবনের ভালোবাসার পূর্ণতার স্বীকৃতি স্বরূপ আগামী ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ অর্থাৎ ভালোবাসা দিবসে আমরা আমাদের প্রথম বংশধরের আগমনের অপেক্ষায় আছি আলট্রাসনোগ্রাম অনুযায়ী। ভালোবাসাময় এই বিশেষ দিনে আমাদের ভালোবাসার অমূল্য ধনের এ আগমনই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে অটুট থাকুক, সারা জীবন সেই কামনা করি। সবাইকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা। প্রমি তোমাকেও।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে

লিটল এনজেল

নিঃস্বার্থভাবে কাউকে স্নেহ করলে, ভালোবাসলে যে পরিণামে প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হয় তা আমার জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি সত্য ঘটনা পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি যাতে করে কেউ কখনো আমার মতো প্রতারিত না হয়।

২০০১ সালের শেষ দিককার কথা ১১ বছরের অসুস্থ একটি ছোট ছেলের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে পরম মমতায়, স্নেহের বাধনে ছেলেটির প্রতি জড়িয়ে গেলাম পিতা-পুত্রের ভালোবাসার বন্ধনে। অদ্ভুত একটা টান অনুভব করতাম ছেলেটির প্রতি।

প্রায়ই সে আমাকে বাবা বলে ডাকতো।

ছেলেটির আচার-আচরণ এমন ছিল যেন আমি সত্যিকার অর্থেই তার বাবা হয়ে গেছি। আমার প্রতি ছেলেটির শ্রদ্ধা-ভক্তি আর ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা খুজে পাইনি।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে এতো স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা আর কাউকে কখনো দিইনি। যতোটুকু এই ছেলেটিকে দিয়েছিলাম। সে ছিল আমার Little Angel (লিটল এনজেল)। প্রতিদিন ছেলেটি আমাকে টেলিফোন করে বলতো, বাবা, আমি তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসি।

ছেলেটিকে কখনো নাম ধরে ডাকিনি। সব সময় *বাবা* বলে ডাকতাম। কতোটুকু গভীরভাবে ভালোবাসলে একটি ছোট্ট ছেলেকে নাম না ধরে ডেকে শুধুই বাবা বলে ডাকা হয় তা পাঠকরা একটু উপলব্ধি করুন!

ছেলেটির বাবা আমার কলিগ ছিলেন। কিন্তু ছেলেটির বাবা মা এবং তার পরিবার সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। টেলিফোনই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। ঢাকাতেই ওদের বাসা।

হঠাৎ ছেলেটি বেশি অসুস্থ (শ্বাসকষ্ট ছিল) হওয়াতে ওদের বাসায় গেলাম। আমাকে ওরা এমনভাবে আপ্যায়ন করলো যেন আমি ওদের পরিবারের একজন, এমনকি মধ্যমণি। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও ওদের চরিত্রের দিকগুলো ধরতে পারিনি। নিখুত অভিনয়ের মাধ্যমে আমাকে ফাদে ফেলা হলো। পরে তা বুঝতে পেরেছি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ফ্ভাবে সব কিছুতে অভ্যস্ত (মদ, মেয়ে মানুষ, পরপুরুষ), উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন তাদের যা বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই।

ছেলেটিকে নিজ সন্তানের মতোই ওর সব চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করতাম। ওর বাবা মায়ের ব্যাপারে কখনো নাক লগাইনি। শুধু বলতাম, তোমরা যদি ভালো না হও তবে তোমাদের সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু ওরা আমার কথায় কোনো পাত্তা দিল না।

একদিন ছেলেটির দাদির মাধ্যমে শুনলাম মাত্র তেরো বৎসর বয়সে ক্লাস সেভেনে পড়া অবস্থায় তার চরিত্রের অবনতির কথা। বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা।

আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। প্রচণ্ড কষ্টে আমার বুকটা ভেঙে গেল। আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। অঝোর ধারায় কেদে ফেললাম। আমার মন ভেঙ্গে গেল। খেতে পারিনা, ঘুমুতে পারি না ছেলেটির কথা ভেবে। অথচ ছেলেটির বাবা মা এসব শুনে নির্বিকার যেন এটা তেমন কোনো ব্যাপারই না।

রক্তের ধারা যাবে কোথায়? যে বাবা মায়ের রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত সে রক্ত তো আর বদলানো যাবে না!

বুকে অনেক কষ্ট নিয়েও সরাসরি ছেলেটিকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু ছেলেটি আমার কথা গ্রাহ্য করলো না। এমন ভাব করলো যেন, তুমি আবার কে আমার কাজে বাধা দেয়ার?

আমি অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। এই কি আমার লিটল এনজেল?

ছেলেটির জন্য অকাতরে টাকা খরচ করতাম। ফলে সে যোগ্য বাবা মায়ের মতো আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। যার সদ্ব্যবহার তার বাবা-মাও করেছে। মানুষ কতোভাবেই না প্রতারিত হয়। ছোট্ট একটা ছেলের ভেতর এতো লোভ থাকতে পারে, স্বার্থপর হতে পারে যা কখনো কল্পনাও করিনি।

আজ আমার সন্তান হয়েছে। তাকে যখন বুকে নিয়ে আদর করি তখন সেই ছেলেটির মুখ ভেসে ওঠে। দু ই চোখে পানি চলে আসে। আমার স্ত্রী তখন বলে, নিশ্চয়ই লিটল এনজেলের কথা মনে পড়েছে।

অতিরিক্ত ভালোবাসা থেকেই হয় ঘৃণার জন্ম। তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করি, ঘৃণা করি তার বাবা মাকে। কাউকে ঠকাতে গেলে নিজেকে ঠকতে হয়। তাই চিরাচরিত কথাটি একদিন অবশ্যই ছেলেটি বুঝতে পারবে। আমার অকৃত্রিম, নিঃস্বার্থ স্নেহ, মায়া, মমতা আর ভালোবাসার দাম যখন বুঝতে পারবে তখন সে কাদবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

মিলন আংকল

জুলি

আপনি এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তিন বছরে আপনি হয়তো আমাকে ভুলে গেছেন। যাবারই কথা, একদিনের ভালো লাগা! ভালোবাসার কথা কতোদিনই বা মনে রাখা যায়!

আপনার সব কথা মনে রেখেছি। পটপট করে বলতে পারি। কিন্তু বলার মানুষটাকে কাছে পাচ্ছি না। যদি দুজনাতে কোনোদিন দেখা হয়, সেদিন পটপট করে বলতে থাকবো, আপনি শুনতে থাকবেন। আর আপনি মিষ্টি কণ্ঠে দুষ্টু করে গান গাইবেন, আশ্চর্য হয়ে দুই গালে হাত দিয়ে গান শুনবো। কোন গানটা জানেন? *তুমকো হামিসে চুরালো।*

আপনি কি জানেন, কি সুন্দর করে এই গানটা গাইতে পারেন? প্রশংসাও বহুবার করেছিলাম। তবে সরাসরি কথা বলার মতো সাহস আমার ছিল না। তাই তো আপনাকে ভালো লাগার কথাটি বলা হলো না। টেলিফোনে আপনার গানের প্রশংসা করেছিলাম। ভেবেছিলাম টেলিফোনেই জানাবো আমার ভালোবাসার কথাটি। কিন্তু সেটা বলার আগেই আপনি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে চলে গেলেন।

অনেকবার আপনার অফিসে ফোন করেছিলাম।

কিন্তু পাইনি আপনাকে। ছোট ভাইয়ের (E) কাছে জানতে পারলাম আপনি ঢাকা চলে গেছেন। কেন আপনি বরিশাল থেকে ঢাকা চলে গেলেন, আমাকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করলেন না? যদি এভাবে চলেই যাবেন তবে আমার হাত ছুয়েছিলেন কেন? কেনে আপনি লিখেছিলেন, ইউ আর সো বিউটিফুল, আই লাভ ইউ।

সবই যদি অভিনয় হয় তবে আমাদের মতো মেয়েদের সঙ্গে নয় এফডিসি-তে যান, সিনেমা করুন, বহুবার এসব ভালোবাসার অভিনয় করতে পারবেন। আমি তো আপনার আশায় বুক বেধে রেখেছি। আমার চাওয়া–পাওয়া অল্প। শুধু মরণের আগে আরেকবার আপনাকে দেখতে চাই।

মাঝে মধ্যে খুব কষ্ট পাই। মনে মনে বলি পৃথিবী যখন গোল, দেখা নিশ্চয়ই হবে। এপারে না হোক, পরপারে তো দেখা হবেই। সেদিন না হয় অজানা প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে নেবো।

এখন ঢাকাতে আছি। কলেজে পড়ছি। যদি এ লেখাটা চোখে পড়ে তবে অনুগ্রহ করে একবার, শুধু একবার ফোন করুন। কিছু বলার দরকার নেই, শুধু আমার নামটা ধরে একবার ডাক দিন। দেখবেন শতবার উত্তর দেবো। ফোন নাম্বার...

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

শরীর

প্রিয় লাভলু, তোমাকে প্রিয় বলে সম্বোধন করলাম। কারণ তুমি আমৃত্যু আমার প্রিয় থাকবে। ২১ নভেম্বর তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার কানে সারাক্ষণ কিছু কথা বাজতো।

কথাগুলো হচ্ছে – I don't want to continue this relationship anymore. এই সম্পর্ক আমি আর চালিয়ে যেতে চাই না। আমি সত্যিই চাই না। আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না। আমি এখন তটিনীকে ভালোবাসি, শুধুই তটিনীকে।

তাই ভয়ে ভয়ে রিং করলাম। তুমি হ্যালো বলামাত্রই হার্ট বিট বেড়ে গেল। ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল, তুমি বুঝি কথাগুলো বলেই ফেললে। কিন্তু তুমি কথা বললে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে। আমার ভয়টা তীব্র হতে শুরু করলো।

সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকে বলবো, তুমি যে রকম সম্পর্ক আমার সঙ্গে রাখতে চাও আমি তাতেই রাজি। এই কথাটা বলার জন্যে ফোন করেছিলাম ২৮ তারিখ। কিন্তু কথাটা বলার সৌভাগ্য আমার হলো না। তুমি কেমন আছো এই প্রশ্নটা তিনবার করার পরও যখন জানতে চাইলে না আমি কেমন আছি তখনই একটু অবাক হয়েছিলাম। তারপর ফোন করতে টাকা লাগে না কথাটা যখন বললে তখনও কিছুটা আহত হয়েছিলাম। তবে কথাটা গায়ে লাগাইনি। ফোনে মেয়ে কণ্ঠস্বর শুনে ভেবেছিলাম সালমা। কিন্তু কণ্ঠস্বর সে লাভলুর wife, এই কথাটা যখন বললো, তখন তাকে চিনলাম। তার আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় কণ্ঠস্বর আমাকে বিস্মিত করলো। আট নয় মাসের রিলেশনে সে এতোখানি প্রত্যয় নিয়ে বলছে, সে তোমার ওয়াইফ! ছয় বছর ভালোবেসে আমিও নিজেকে তোমার ওয়াইফ ভাবতে পারি, She should know it. তাই আমিও একই কথা বলেছিলাম।

২১ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত তুমি বলতে পারো এ রকম অনেক নেগেটিভ কথা ভেবেছি। কিন্তু ভুল করেও ভাবিনি তুমি আমাকে গালাগালি করতে পারো। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে তুমি গালাগালিই করলে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তুমি আমাকে *শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা* বলতে পারো! আমার

শুধুই মনে হচ্ছিল আমার শুনতে ভুল হয়েছে। কথাগুলো তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বলোনি। কারণ তুমি এমন কথা আমাকে বলতে পারো না যেহেতু তুমি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সন্তান। তুমিও শিক্ষিত ভদ্রলোক। তাছাড়া আমি তোমার সাবেক প্রেমিকা। এক সময় তুমি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতে। বলবেই বা কেন, আমি তো তোমাকে কোনোভাবে বিব্রত কিংবা বিরক্ত করতে চাইনি কখনো। আমার মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটছে না, এটা দুঃস্বপ্ন। ভীষণভাবে চাইছিলাম পুরো ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন ভাবতে। তোমার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা আমাকে এমনটা ভাবাতে চাইছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছে যখন বুঝলাম, কথাগুলোকে সত্যি বলে ভাবতে পারছিলাম কিছুটা হলেও ঠিক তখনই আমাকে রীতিমতো হতবাক করে দিয়ে তুমি *মাগী তুই* বললে, আমাকে অন্য পুরুষের খোজে নামতে বললে। কারণ তোমার বৌ আছে, বিয়ে না করা বৌ যাকে তুমি পছন্দ করো না (তুমি বলেছিলে)। যার তুলতুলে একটা শরীর আছে তোমার খেদমতে। মাঝে মাধ্যেই ওই সাড়ে চার ফিটি শরীরের অলিগলি তুমি ঘুরে বেড়াও। পায়ের নখ থেকে চুলের গোড়া পর্যন্ত সাতার কাটো তুমি। তাই ও সাড়ে চার ফিটি ফুটবল (তোমার ভাষায় শাদা বিড়াল) তোমার বৌ।

ছয় বছর ধরে তোমাকে ভালোবাসি। তাই তোমার ভাষায় *মাগী যার মানে বেশ্যা*। আমার জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়া তুমি কেন্দ্রিক। ফলে আমি বেশ্যা। তোমাকে জড়িয়ে জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা করেছি, এ জন্য আমি বেশ্যা। গত ছয় বছরে কোনো ছেলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিনি, কাউকে ভালো লাগেনি এ কারণে আমি বেশ্যা। তোমাকে, তোমার বাবা–মাকে তোমার বোনকে সবচেয়ে আপন ভেবেছি বলেই আমি বেশ্যা। তোমাকে ভালোবেসে তোমার সন্তানের মা হতে চেয়েছি তাই আমি বেশ্যা। বাবা–মা, ভাই–বোনের ভালোবাসাহীন এই জীবনে তোমার ভালোবাসা, তোমার পরিবারের ভালোবাসা নিয়ে কাটাতে চেয়েছি এ জন্য আমি বেশ্যা। আমার শরীরটা তোমাকে কখনো সাধিনি এ কারণে আমি বেশ্যা। শুধু তোমাকে ভালোবেসেছি শুধুই তোমাকে। ফলে আমি তোমার দৃষ্টিতে বেশ্যা। আর কি কি কারণে আমি বেশ্যা kindly একটু বলে যাবে! আমার যে খুব জানতে ইচ্ছা করে?

আমার জন্য আরো যে অনেক বিস্ময় সামনে অপেক্ষা করছে সেটা ভুলেও ভাবিনি। Just তোমার কণ্ঠস্বরটা একটু শুনবো বলে সে রাতে রিং করেছিলাম। কিন্তু ফোনটা তোমার বৌ ধরলো এবং আমার ফ্রেন্ড আমি হয়ে গালি দিল। কাজটা আদৌ অন্যায় ছিল না। কারণ বেশ্যারা এ রকম গালিগালাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। আমি তো তোমার কাছে, তোমার বৌ–এর কাছে বেশ্যা, তাই না? তুমি সৎচরিত্রবান পুরুষ ভাইয়াকে বিচার দিলে। তুমি খুব ভালোভাবেই জানতে, ভাইয়া কি ভয়াবহ শাস্তি আমায় দেবেন। এটা ভেবে মহা আনন্দে অবিবাহিত স্বামী–স্ত্রী নিশ্চয়ই নেচেছো।

তোমাদের উল্লাসটা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে বলছি, ভাইয়া শাস্তি দিয়েছেন। তিনি আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এই জানুয়ারি মাসটা বরিশালে আছি। আপুর পরীক্ষা শেষ হলেই চলে যাচ্ছি চিরতরে। আর মাত্র পনেরো বিশ দিন আছি আমার পৃথিবীতে। তারপর গৃহবন্দী জীবন। সব কিছু, সমস্ত হারিয়ে বাসায় যাচ্ছি।

কি। খুশি তো?

যাই হোক। বেশ্যাদেরও তো কাউকে ভালোবাসার অধিকার আছে, স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে, তাই না! ফলে আমিও স্বপ্ন দেখি তোমাকে পাওয়ার। আজও দেখি। এতো কিছুর পরও দেখি। অবশ্য একটু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছি তোমার কৌমার্য অটুট নেই। Already you have lost it. তুমি যদি আরো বহুজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যাওয়ার পরও আমাকে বিয়ে করতে চাও, আমি করবো। আমি আমার মন এবং শরীরের সবটুকু বিশুদ্ধতা দিয়ে তোমাকে আমার করে নেবো। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকো, আমার শুভ কামনা তোমার সঙ্গে থাকবে। যাকেই বিয়ে করো নিজে নিজে নিশ্চিত হয়ে নিও যে, তুমি তাকে ভালোবাসো। তাকে তোমার মন চাইছে। শুধু শারীরিক প্রয়োজনে বিয়ে করো না। ভালো থেকো।

নাম ঠিকানা বিহীন

১০ জানুয়ারি ২০০৫

পরাজিত রাজকন্যা

– নাজমুন নাহার মুক্তা

শ্রাবণ এসেছিল। তুই ঘুমোচ্ছিস শুনে বললো, থাক আন্টি, ডাকতে হবে না। রাজকন্যার স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। পাচ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠলেই দেখা হতো। মা বললেন আমাকে।

শ্রাবণভাইয়া এসেছিল! যাকে নিয়ে আমার এতো স্বপ্ন, যাকে নিয়ে আমার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে অনন্তের মাঝে, যার সঙ্গে স্বপ্নে ঘুরে বেড়াই নায়াগ্রা, নীলনদ, কাঞ্চনজংঘা, যার হাত ধরে চোখে চোখ রেখে এক জীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সে আমার জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসেছিল!

ইচ্ছে করে এই পনেরো তলা বিল্ডিংয়ের ছাদে গিয়ে চিৎকার করে বলি, *আমার চেয়ে সুখী আছে কি কেউ এই পৃথিবীতে?* আনন্দে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় এ আনন্দটুকু নিয়েই মরে যাই।

বাবার বন্ধুর ছেলে শ্রাবণভাইয়া। দুই পরিবারের খুব ভালো সম্পর্ক। এতো ভালো যে, ওদের বাসায় আমার একটা আলাদা রুম আছে যে রুমে আমি ছাড়া অন্য কারো থাকার অনুমতি নেই। এমনকি বাসায় অনেক গেস্ট এলেও না।

মা, খুশি গলায় বলেন, জানিস, শ্রাবণের বিয়ে। শেষ রোজার দিন বিয়ে। ওর নাকি অনেক দিনের ইচ্ছে ঈদের আগের দিন বিয়ে করার। নতুন বৌকে নিয়ে ঈদ করবে। পাগল ছেলে। তোকেই প্রথম ইনভাইট করতে এসেছিল। তুই নাকি এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। তাই তোকেই ...।

মায়ের কথাগুলো আমার কানে আসছিল ঠিকই কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কি শুনছি।

মুহূর্তেই আমার সাজানো পৃথিবীটা ভেঙে যায়। শুনে হয় কোনো এক টর্নেডো আমার ভেতরটা ওলট–পালট করে দিয়ে গেল এক নিমেষেই। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি মায়ের দিকে।

মা আবার বলেন, রিমিকে তো চিনিস, শ্রাবণের সঙ্গে পড়ে। ওর সঙ্গেই বিয়ে। গতবার যখন ওদের বাসায় যাই তখনই বিয়ের তারিখ ফাইনাল হয়। শ্রাবণ তোকে বলতে নিষেধ করেছিল। একেবারে কার্ড দেখিয়ে তোকে নাকি সারপ্রাইজ দেবে। এ জন্যই বলা হয়নি।

প্রচণ্ড কষ্ট হয় আমার। শাওয়ার ছেড়ে অনেকক্ষণ কাদি। কখনো ভাবিনি এক জীবনে এতো কাদতে হবে। মনে হয় পনেরো তলা বিল্ডিংটা আমার ওপর ভেঙে পড়ছে। ঢুকে আছি এক ধ্বংস স্তূপের মাঝে যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। অথচ তুমি হাত বাড়ালেই ...।

রাতে ফোনে কথা হয় তোমার সঙ্গে। তুমি বিয়ের শপিংয়ের পুরো দায়িত্ব দিলে আমার ওপর। বললে, তোর মতো এমন ভালো বন্ধু আমার আর নেই। রিমির অনেক প্রশংসা করলে। তুমি এতো আনন্দে ছিলে যে, আমার কান্না জড়ানো কণ্ঠ তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

একবার মনে হয়েছিল সব বাধাকে তুচ্ছ করে তোমাকে সত্য কথাটা বলেই ফেলি। তুমি কি একটুও বোঝোনি আমি তোমাকে ...।

ফোন রেখে চোখ বন্ধ করে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি। আমার এই বাইশ বছরের জীবনে এতো গভীর ও অসহায়ভাবে কোনোদিনও কিছু চাইনি।

মনে আছে তিন বছর আগে তোমার সেই জন্মদিনের কথা? আমি শাদা একটা শাড়ি পরেছিলাম। চুলগুলো ছিল পিঠের ওপর ছড়ানো। কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ।

তুমি দরজা খুলে বললে, ওয়াও! তোকে একদম গৃক দেবীর মতো দেখাচ্ছে। তারপর চিৎকার করে আন্টিকে ডেকে তোমার সব বন্ধুদের সামনে বললে, মা দেখো, আমাদের রাজকন্যাকে একদম গৃক দেবীর মতো দেখাচ্ছে। তাই না?

আন্টি কপট রাগ দেখিয়ে বলেন, না। একদম না। বরং গৃক দেবী আমাদের রাজকন্যার মতো।

তারপর থেকে তুমি আমায় ডাকতে দেবী।

কিছুদিন পর তোমাদের বাসায় যাই। তুমি বাসায় ছিলে না। আর আন্টি ছিলেন আমার প্রিয় আইটেম রান্না করায় ব্যস্ত।

গল্পের বই খুজতে তোমার রুমে যাই। টেবিলের ওপর ডায়রিটা দেখে অন্যায় জেনেও খুলি। শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছো, তোমার জন্মদিনের রাতে।

লিখেছো, *দেবী, আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার দুই হাত আলতো করে ধরে চোখে চোখ রেখে বলি, দেবী, জীবনটা বদলাবে? চলো জীবনটা বদলে ফেলি। চলো সব স্বপ্নগুলো পূরণ করি। দেবী, চলো তোমাতে–আমাতে মিলে পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় আনি। দেবী, যাবে?*

ডায়রিটা নিয়ে তোমার খাটে ধপ করে বসে পড়ি। অনেকবার পড়ি লেখাটা। কতোবার তার হিসাব জানা নেই। আমার জন্য এতো বিস্ময়, এতো আনন্দ থাকতে পারে তা কখনো ভাবিনি! আমার ভেতর আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। নিজেকে সারা বিশ্বের সম্রাজ্ঞী মনে হয়।

বাসায় ফিরে তোমাকে ফোন করি।

তুমি ফোন ধরেই বললে, এই বুদ্ধু, আরেকটু অপেক্ষা করলে কি *মহাভারত* অশুদ্ধ হয়ে যেতো?

হেসে বলেছিলাম, দেখো, ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা করবে না। আজকে আমার ঝগড়ার মুড নেই।

তো দেবী, আপনার মুড আজ কোনদিকে প্রবাহিত?

জানি না।

জানতে হবে না। আগামীকাল তোর সময় হবে? এই ধর দুপুর একটার দিকে? বাইরে লাঞ্চ করবো। তারপর একটা কাজ আছে। এখন তোকে বলা যাবে না। দেবী, সময় হবে?

মনে মনে বলি, তুমি চাইলে না করি সেই সাধ্য আছে কি আমার? কিন্তু মুখে বলি, আগামীকাল আমার ক্লাস নেই, সারা দিন বাসায় আছি।

ওকে। তোকে বাসা থেকে পিক করবো।

পরদিন বাসায় এসেই তুমি বললে, কি রে, রেডি?

হ্যা, রেডি। কিন্তু মা তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছেন।

খেয়ে যেতে বলেছেন মানে? আমরা বাইরে লাঞ্চ করবো না?

মা গোসলে। একটু অপেক্ষা করো, মা বের হলে সেটা তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

মাকে তুমি বললে, খেতে পারি এক শর্তে, যদি তুমি খাইয়ে দাও।

আমি বলি, মা, এতো বড় ধামড়া ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছ কেন?

তুমি আমার চুল ধরে জোড়ে একটা টান দিয়ে বললে, শোন পচু, মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা কখনো বড় হয় না। বুঝেছিস?

ন্যাকা। আদর কুড়ানোর যতো ঢং!

মা বলেন, আহা! শুধু শুধু ছেলেটার পেছনে লেগেছিস কেন?

শোনো মা, আমি কারো পেছনে লাগিনি। সত্য কথা বলছি।

কোথায় যাবে তা তো বললে না?

তুমি খুব রেগে বললে, এতো প্রশ্ন করিস কেন? বলেছি একটা কাজ আছে। আমার সঙ্গে যাবি, ব্যস। যেতে ইচ্ছে না করলে বল কেটে পড়ি।

তুমি এতো বিশ্রীভাবে কথা বলছো কেন? ঠিক আছে, চলো।

শোন, এখন আমরা জুয়েলারি দোকানে যাচ্ছি। একটা রিং কিনবো।

কি কিনবে?

ডায়মন্ড রিং।

কার জন্য?

আমার এক বন্ধুর জন্য।

ছেলে, না মেয়ে?

বুদ্ধু! ছেলের জন্য কিনতে যাবো কোন দুঃখে?

শুধুই বন্ধু?

না, স্পেশাল ফ্রেন্ড।

উপলক্ষ?

এই মুহূর্তে বিশেষ কোনো উপলক্ষ নেই। তবে ভবিষ্যতের জন্য।

আমাকে আনলে কেন?

কারণ, তুই খুব ভালো করেই জানিস, আমি তোর মতামতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই।

ব্যস, এই জন্য?

আরেকটা কারণ আছে।

চমকে তোমার দিকে তাকিয়ে বলি, সে কারণটা কি?

কারণটা হলো ...। না থাক।

মনে মনে বলি, লুকানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আমি তোমার ডায়রি পড়েছি।

খুব চমৎকার একটা রিং কিনলে আমার আঙুলের মাপে।

হলুদের আগের রাতে অনেক কথা হয় তোমার সঙ্গে। বললে, আমরা সব সময় খুব ভালো বন্ধু থাকবো। এতো ভালো যে, যাকে সব কথা বলা যায়, যে বাচার আগ্রহটাকে বাচিয়ে রাখে, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দাড়িয়েও আশার আলো দেখায়, অন্ধকারকে অস্বীকার করতে শেখায়। তুই আমার ঠিক এ রকম বন্ধু। আমার জীবনে একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু।

কথাগুলো শুনে হয়তো আমার খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু পারিনি খুশি হতে।

তুমি আমাকে কখনো রিমির কথা বলোনি কেন?

আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। সব কিছু এতো তাড়াতাড়ি ...। আর ...।

থাক বলতে হবে না। রিমির কথা বলো। রিমি তোমার কাছে কি রকম, এই আর কি!

ও আমার কাছে দেবী।

দেবী!

হ্যা দেবী। আমি দুজনকে দেবী বলি এ পৃথিবীতে। তোকে আর রিমিকে। তুই আমার রাজকন্যা এবং দেবী। আর রিমি শুধু আমার দেবী কিন্তু রাজকন্যা না।

এতোক্ষণে বুঝতে পারি কি ভীষণ ভুল করেছি। আমার সারা জীবনের সফলতার ঝুড়িতে এই প্রথম জমা হয় ব্যর্থতা। এ প্রথম মনে হয় সব কিছুই অর্থহীন।

তোমার বিয়েতে ছিলাম সবচেয়ে বেশি হাসি খুশি যেন এর চেয়ে আনন্দের ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। সবাই আমার বাইরের আনন্দটা দেখে। কাউকে বুঝতে দিই না ভেতরের কষ্টটা।

তোমার বিয়ের দুই মাস পর চলে আসি লন্ডনে এমবিএ করতে।

বাবা মায়ের নিষেধ, উৎকণ্ঠা। বন্ধুদের অনুরোধ। স্বপ্নের আইবিএ-তে পড়ার সুবর্ণ সুযোগ সব কিছুকে তুচ্ছ করে চলে আসি এই ব্যস্ত শহর লন্ডনে। সবাই জানে স্কলারশিপ পেয়েছি, এ জন্য এখানে পড়তে এসেছি। কিন্তু আমি তো জানি স্কলারশিপ কোনো ব্যাপারই নয়। তোমাকে এড়িয়ে চলাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য।

এখন আর ঈদ আমার জীবনে আনন্দ বয়ে আনে না। শুধু ঈদ কেন কোনো আনন্দই আমাকে স্পর্শ করে না। এখানে হয়তো ঈদের দিনেও ক্লাসে যেতে হবে। ক্লাসের পর আছে লাইব্রেরি ওয়ার্ক। এর ফাকে দেশে ফোন করে বাবা, মায়ের সঙ্গে কথা বলবো। হয়তো তোমাকেও একবার ফোন করবো। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও কোনো কথা বলা হবে না। তুমি কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বলবে, তারপর আস্তে করে লাইনটা কেটে দেবো।

পৃথিবী তার নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। বছর ঘুরে আবারও ঈদ আসবে। পৃথিবীর সবাই মেতে উঠবে আনন্দ উৎসবে। কেবল সবার মাঝ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখবো। আনন্দে মেতে ওঠার অক্লান্ত চেষ্টা করবো। সবাই দেখবে বাইরের আনন্দটা। কিন্তু কেউ জানবে না আমি কি হারিয়েছি, কেউ জানবে না এই পরাজিত রাজকন্যার গল্প।

মিরপুর, ঢাকা থেকে
najmun@mail.com

অণিকা

– মাহফুজ

আমি মাহফুজ। বয়স আটাশ বছর। বিশ বছর বয়স থেকে ড্রাগস নিই। প্রথমে কিভাবে ড্রাগস নেয়া আরম্ভ করি তা বলছি।

কয়েক বন্ধু আগে থেকে ড্রাগস নিতো এটা জানতাম। আমার রাতে ঘুম না হওয়াতে তাদের সঙ্গে আমিও ড্রাগসে যোগ দিই। সেই থেকে শুরু। আজ পর্যন্ত ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত আছি।

আমার কাছে, ড্রাগসের কাছে মেয়েমানুষ কিছু না। পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর মেয়েদের ছাড়তে পারি। কিন্তু এই ড্রাগস আর ছাড়তে পারবো না। পৃথিবীর কোনো কিছু ভালো লাগে না। সব কিছুতে অনীহা আসে। তারপরও নেশা ছাড়তে পারি না।

আমার বোনকে একটি মেয়ে পড়াতে আসে এটা জানতাম। কিন্তু কোনোদিন তার দিকে তাকাইনি। কারণ সেই নেশা।

একদিন সকালে নেশা করিনি তখন কলিংবেল বেজে ওঠে। দরজা খুলে দেখি আমার খালাতো বোনকে যে মেয়েটি পড়ায় সে দাড়িয়ে। আমার কেন যেন মনে হলো সে আমাকে নেশা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এই পর্যন্ত কোনো মেয়েকে কোনোদিন ভালোবাসার কথা বলিনি। আমার মনে হয় এ জীবনে এতো সুন্দর মেয়ে দেখিনি। নিজের মনকে বোঝাতে লাগলাম। কোনো নেশাখোর ছেলেকে কোনো বুয়েটে পড়া মেয়ে ভালোবাসতে পারে না। মন বলে কথা কিছুতেই বুঝ দিতে পারি না।

এক সময় মনে হয় এই মেয়েকে পেলে নেশা ছাড়তে পারবো। তার কথা চিন্তা করে বেশ কয়েকদিন নেশা করিনি। কিন্তু কিভাবে বলবো? কারণ আমি খালার বাসায় থাকি। নেশা করি এটা আমার পরিবারের সবাই

জানে। কয়েকবার চিকিৎসা করেও নেশা ছাড়তে পারিনি। সেই আমি এই মেয়ে দেখে নেশা করিনি বেশ কয়েকদিন।

তাকে দেখলে মনে হয় আমি পৃথিবীতে আবার নতুন জীবন ফিরে পাবো।

অণিকা, আমাকে বাচাও। তুমিই পারো আমাকে বাচাতে। তোমার একটু ভালোবাসা আমার মতো ছেলেকে ভালো করতে পারবে। অণিকা, তোমার ভালোবাসার হাতটি বাড়াও, দেখবে আমি আবার নতুন জীবন ফিরে পাবো।

অণিকা, আল্লাহ তোমাকে আমাকে ভালো করার জন্য, পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাচার জন্য পাঠিয়েছে। তোমার একটু ভালোবাসা পেলে আমি সুন্দর পৃথিবীতে বাচতে পারি।

তুমি ভালো ছাত্রী এবং ভালো ছেলে পেতে পারো, এটা জানি। কিন্তু আমার মতো ছেলেকে ভালো করে পৃথিবীতে বাচতে পারাটা আরো সুন্দর। অন্তত আমার কাছে মনে হয়। একটু ভালোবাসা দিয়ে যদি আমার জীবন বাচাতে পারো তাহলে আল্লাহর কাছে আমি দুই জনমে কিছু চাই না। আমাকে তুমি তোমার ভালোবাসা দিয়ে বাচাও।

তোমার গালের ওই তিলগুলো নিয়ে কল্পনার রাজ্যে চলে যাই। আমার খালাতো বোনের কাছে শুনতে পারলাম, তুমি কক্সবাজার বেড়াতে যাচ্ছ। যদি যেতে পারতাম সমুদ্র সৈকতে, তোমার হাতটি যদি আজীবন ধরে রাখতে পারতাম, এটা আমার কল্পনা।

তোমাকে না দেখে থাকবো কি ভাবে? যেখানে তোমার যাতায়াত, চুপিচুপি দেখি। কেউ আমাকে দেখতে না পায়, তুমি পর্যন্ত। তুমি কি জানো, তুমি যখন পড়াও তখন তোমার স্যানডাল আমার রুমাল দিয়ে মুছে দিই? তোমার হাতের লেখা দেখি আর ভাবি, কিভাবে আমার ভালোবাসার কথা তোমাকে বলবো!

এই ভালোবাসা দিবসে তোমার কাছে আমার করুণ আবদার, তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে মানুষ করো। তুমি যেন গৌরব করতে পারো, দেখো আমার ভালোবাসা দিয়ে আমি একজন মানুষ তৈরি করতে পেরেছি। সে আমার ভালোবাসার মানুষ এবং আমার স্বামী।

জানি শিক্ষার দিক দিয়ে তুমি আমার চেয়ে অনেক উপরে। কিন্তু জেনে রেখো, তোমার ভালোবাসা পেলে আমি আবার আরাম্ভ করতে পারবো শিক্ষা জীবন। তুমি যেভাবে বলবে সেই ভাবে তৈরি হবো।

তুমি কি জানো আমার, নেশার জন্য আমার মা বাবা কাদেন আর বলেন, আল্লাহ, আমার ছেলেকে ভালো করে দাও?

অণিকা, বিশ্বাস করো, তুমি আমার হলে আমার মা বাবার আশা পূরণ হয়ে যাবে। তোমার জন্য তারা আজীবন দোয়া করবেন। এটা কি বড় একটা পাওয়া নয়?

মিরপুর, ঢাকা থেকে

স্বামী সুখ

– শাহনাজ নার্গিস শাম্মী

শরীরে মেয়েলি গুণাবলী আসার আগে থেকেই নিজেকে খুব সুন্দর ভাবতাম। অবশ্য এই ধ্যান ধারণা আমার ভেতর জন্মেছিল বাড়ির অন্যদের কথাবার্তায়।

যখন ক্লাস নাইন শেষ হবে সে সময়ই নিজেকে আবিষ্কার করলাম দ্বিতীয় মাধুরী হিসেবে (ঐশ্বরিয়া তখনো বিশ্ব সুন্দরী হয়নি)।

মা–বাবাও কথাচ্ছলে বলতেন, আমাকে বিয়ে দেবেন দ্বিতীয় শাহরুখ খানের সঙ্গে (ঋত্বিক রোশন তখন কোথায় যেন ছিল)।

এই বিয়ের ব্যাপারটা তাদের মুখের কথা হলেও মনে ছিল মেয়েকে হারানোর ভয়। কারণ আমার ফেরশতাতুল্য বাবার আমার দুটি মেয়ে, আমিই বড়। ছেলে না থাকার কষ্ট মা-বাবার ছিল কি না জানি না। তবে সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিলাম বিয়ে আমি করবো না। কারণ মা বাবাকে অসহায় করে কোনো অজানা, অচেনা পুরুষের সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারবো না।

সুদর্শন কোনো নায়ক মার্কা চেহারার ছেলে দেখলে আকৃষ্ট হতাম যে না সেটা মিথ্যা। কিন্তু সবাইকে আমার শত্রু মনে হতো। কারণ আমার ধারণা ছিল, পুরুষ মানেই নারীর ওপর অধিকার ফলানোর ক্ষমতার অধিকারী। তারা শুধু ভালোবাসা নিতে জানে, নারীকে ভোগ করতে জানে আর জানে বিয়ে করে একটি মেয়েকে তার মা-বাবা থেকে আলাদা করে রাখতে।

যাকগে, এভাবেই চলছিল। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা সামনে। হঠাৎ মা-বাবার মুখে শুনি আমার বিয়ে দেয়া হচ্ছে। ছেলে বাংলাদেশ বিমানে চাকরি করে, ঢাকায় থাকে। বড় মামাকে দিয়ে বাবা সব খোজ খবর নিয়ে ফেলেছেন।

সব ঠিকঠাক, এখন শুধু বিয়ে। আমি তো রাজি না। আমার এক কথা, মা-বাবাকে একা করে দূরে কোথাও স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতে পারবো না অর্থাৎ থাকবো না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদি, নানি চাচা-চাচি, মামা-মামি, খালা, ফুপু সবার অনুরোধ মেনে নিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। তবে একটা শর্ত দিয়ে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে মতের মিল না হলে সোজা বাবার বাড়ি চলে আসবো।

বাবা রাজি হলো।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম মতের মিল তো ইচ্ছা করেই করবো না।

বিয়ের দিন অনেক কাদলাম। কাবিনে সই করতে গিয়ে জ্ঞান হারানোর মতো সকল পন্থাই অবলম্বন করলাম যদি... যদি বিয়েটা বাদ দেয়া যায়। কিন্তু ... কিছুই করতে পারলাম না।

বাসর রাতে স্বামী নামের লোকটির সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিনি।

তারপর?

দিন, সপ্তাহ, মাস ঘুরে বছর গেল। আমি এখন বাবার বাড়ি। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের আগেই সেই স্বামী নামের মানুষটির (বিয়ের আগে যাকে অমানুষ মনে করতাম) সন্তানের মা হতে চলেছি। কিভাবে যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল।

বিয়ের পর তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার সুযোগই পেলাম না। সারাক্ষণ কেমন জানি জ্বালাতন করে। অফিসে যাবার সময়, আসার সময়, দিনে-রাতে, ছুটির দিনভর সারাক্ষণ পেছনে লেগে থাকে আর কেমন কেমন যেন করে। কি সব আজেবাজে কথা দিয়ে গল্প বানিয়ে আমাকে পটায়।

এক সসয় নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করলাম। দেখি সুখ সুখ অনুভূতি। কখন যেন নিজেকে তার ভেতরে হারিয়ে ফেললাম।

স্বামীর এতো ভালোবাসা পাবো সেটা কখনো কল্পনাও করিনি। সত্যিই আমি খুশি, সুখী, তৃপ্ত তার ভালোবাসা পেয়ে। এখন মনে হয় নারীর জন্মই বুঝি আমার স্বামীর মতো সুন্দর মনের একজন পুরুষের বৌ হবার জন্য।

মা-বাবার সঙ্গ এখন আর আমাকে আগের মতো আনন্দ দেয় না। বাবার বাড়ি এখন বড্ড একঘেয়ে লাগে। তাকে ছাড়া একটি মুহূর্ত থাকতে চাই না, পারিও না।

বাবা মাঝে মধ্যে আমার স্বামীর সুখের অংশীদার হয়ে দুষ্টামি করে বলেন, মা জামাইয়ের সঙ্গে মতের মিল না হলে আমার কাছে চলে আসিস।

তখন বাবাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেদে ফেলি।

বাবার চোখেও পানি আসে। কিন্তু বাবা সেটা আমাকে দেখতে দেন না।

ভালোবাসা দিবসে যাযাদি-র সকল পাঠকদের ভালোবাসা একত্রে করে আমার স্বামীকে উপহার দিতে চাই। মুখে তো তাকে বলা হয়নি। কিন্তু সত্যি তাকে অনেক অ-নে-ক ভালোবেসে ফেলেছি।

আরাপপুর, ঝিনাইদহ থেকে

A

যাকে নিয়ে লিখতে বসেছি সে আমার ভালোবাসা, আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা সব কিছু। কিন্তু তাকে আজও দেখিনি।

২০০৩ সালের এপৃল মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের দিক ফ্রেন্ডশিপ করার জন্য একটা ছেলেকে চিঠি লিখি। যে নামটার জন্য তাকেই মিতালী থেকে নির্বাচন করি সেই নামটার প্রথম অক্ষর A। এপৃল মাসের ২৪ তারিখে তার চিঠি পাই এবং শুরু হয় আমাদের চিঠির লেন-দেন। এভাবে চললে যা হয়!

সে আমাকে প্রেম নিবেদন করলো। প্রথমে না করে দিই। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি, বলি, আমাকে অতো দূরে বিয়ে দেবে না। এও বলি যে, ভালোবাসার শেষ পরিণতি বিয়ে, তাই যদি সম্ভব না হয় তবে কেন প্রেম করবো।

কিন্তু A মানতে চায় না।

আর নিজেকে কতো লুকিয়ে রাখবো! আমিও যে তাকে ভালোবাসি বলতে পারিনি।

এরই মাঝে একদিন A ফোন করলো। বললো, তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।

বলি, এটা তোমার আবেগ, একদিন এ আবেগ চলে যাবে।

বললো, আবেগ থেকেই যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয় তা কি বোঝো না?

তারপর শুরু হলো আমাদের প্রেম।

এরই মাঝে আমাদের ছবিরও লেন-দেন হয়ে যায়।

ওর মিষ্টি চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই আমি। A সুন্দর। সুন্দর বললে ভুল হবে, অপূর্ব। আমার কাছে A চাদের চেয়ে সুন্দর। কেন জানি না, A-এর চিঠি পেতে দেরি হলে আমার কিছুই ভালো লাগতো না। মনে হতো আমার পৃথিবীটা আধার হয়ে গেছে। A-কে খুব ভালোবাসি।

এভাবে চলতে থাকে দিন গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস। আমার কল্পনার রাজত্বে A-কে নিয়ে প্রাসাদ গড়ে তুলি। যখন আমার রাজ্যে A-র বসবাস তখন কাল হয়ে আসে আমার বিয়ের প্রস্তাব। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার বিয়ে হয় না। চলতে থাকে প্রেম।

একদিন বাড়ির বাইরে বসে একা আকাশের দিকে তাকিয়ে A-র কথাই ভাবছিলাম। তখনই A-র ফোন এলো।

আমার এক কাজিনের ফোনে কথা বলতাম।

সে ফোন এনে দিল আমাকে। আমি কথা বলছিলাম আর হাসছিলাম।

A বললো, এতো হাসি কেন? খুব খুশি মনে হয়?

বললাম, কেন, দুঃখ পেতে বলো?

A বললো, না, না খুশিই থাকো।

এরপর A আমার এক বোনের সঙ্গে কথা বললো।

তারপর আবার আমার সঙ্গে। এক সময় A জানতে চাইলো, আবার কবে ফোন করবো? বললাম, কবে যে বলবো!

আমার বোন বললো, বলে দে, এতো ফোন করার কি দরকার!

আমিও কিছু না বুঝেই ওকে বলি, কি হবে এতো ফোন করে!

এই এক কথায় রেগে যায় সে। বলে, ঠিক আছে, ফোন করবো না, কোনোদিন করবো না। আর করবো না, রাখি।

রেখে দেয় সে।

তারপর বুঝতে পারি সামান্য একটা ভুলের জন্য অনেক কষ্ট পেতে হবে আমায়। হয়ও তাই। অনেক দিন আর চিঠি পাই না A ফোন করাও ছেড়ে দেয়।

আমি ফোন করলে ওকে পাই না। ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখি। তারপর উত্তর পাই।

ওই চিঠিতে A অভিমান করে লিখেছে সেদিন ফোন করতে না করলে, কিছুদিন পর বলবে চিঠি দিও না, তারপর বলবে আমাকে ভুলে যাও। সেদিন হয়তো এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি থাকবো না।

তারপর ওর মান ভেঙে যায়।

আবার আগের মতো হয়ে যায় সম্পর্ক।

এরই মধ্যে ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য টেস্ট হয়। আমার রেজাল্ট খারাপ হয়।

যখন সবাই জানলো পরীক্ষা দিচ্ছি না, শুরু হয়ে গেল পাত্র দেখার পালা।

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কি করবো কিছুই ভেবে পাই না।

আমাদের বাড়িতে সবাই জানে, A আমার বন্ধু, শুধুই বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে। তাই কেউ কিছু বলতো না।

একদিন একটা চিঠি ধরা পড়ে যায় ভাবীর কাছে।

তারপর হাজার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে।

A–কে জানাই আমার সমস্যার কথা।

A বলে, তারও নাকি সমস্যা। পাচ ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া সব ঠিক। আমার ছবি দেখে পছন্দ করেছে সবাই।

দুরু দুরু বুকে দিন কাটাই। পাত্র পক্ষ আমাকে দেখতে আসে, পছন্দ করে। কিন্তু আমার এক কাজিন পাত্রের দোষ ধরায় বিয়ে হয় না। মনে মনে বলি, ভাইয়া কতো ভালো!

সেই ভাইয়ার কাছেই A আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়।

রেগে যায় ও।

জানাজানি হয়ে যায় আমাদের কথা।

আমাদের প্রেমের কথা শুরু থেকে জানতো একজন। সে আমার ছোট ভাই।

আমার বিয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন চলতে থাকে। খুব বিপদে পরে যাই। A–কে বার বার বলি।

A নীরব থাকে।

A অবশ্য অনেক আগেই বলেছিল পালিয়ে বিয়ে করার কথা, আমি না করেছি। এবারও সে ওই একই কথা বলে।

A প্রস্তাব দিতে রাজি হয় না। A-কে অনেক বোঝাই। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। কি করবো বুঝতে পারি না। মাঝে মধ্যে মনে হয় A হয়তো আমাকে ভালোই বাসে না। খুব কষ্ট দেয় ওর ব্যবহার আমাকে।

A আমাদের এখানে বেড়াতে আসতে চায়। ভয়ে বার বার না করি।

জানি না A আমাকে কেমন ভালোবাসে! ওর চিঠি পেলে মনে হয় ও আমাকে খুব ভালোবাসে। A ফোন করলে মনে হয় আমাকে না পেলে ও বাচবে না। আবার ওর নীরবতা দেখলে মনে হয় সবই ওর অভিনয়। কোনটাকে ঠিক ভাববো জানি না।

এভাবেই কেটে যায় চার মাস। এর মধ্যে আমাদের মাঝেও মান-অভিমান হয়। রোজা এসে যায়। ভাবতে থাকি ওকে কেমন ঈদ কার্ড দেবো, কিভাবে শুভেচ্ছা জানাবো।

আবার বাধা পড়ে পাত্র পক্ষ দেখতে আসে আমাকে। বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যায়।

এভাবে চলে আসে ঈদ। A-কে শুভেচ্ছা জানানো আর হয় না।

১৫ তারিখ ঈদের দিন আমার স্মরণীয় দিন। A-র সঙ্গে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা কথা বলি। সবচেয়ে বেশি কথা সেদিন বলি। ওকে প্রস্তাব দিতে বলি।

A বলে চলো কোর্ট ম্যারেজ করবো।

আমার ভালো লাগে না ওসব। বলি, আগে প্রস্তাব দাও। না করলে তখন পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করা যাবে।

ও কাপুরুষের মতো শুধু পালাতে চায়। ফোনে A আমাকে কিস দেয়। আমাকেও কিস দিতে বলে।

আমি না করেছি।

একদিন A আমাকে বলে, শনিবারে তোমাদের ওখানে আসছি।

অনেক প্রতীক্ষায় কাটে আমার দিন। অনেক দিন পর তাকে দেখবো, এবার বাস্তবে দেখবো তাকে! আমার স্বপ্নের রাজকুমার, কল্পনার পুরুষকে কাছে পাবো।

খুব কষ্টে আসে সেই দিনটি। হা সেই দিনটি আসে! কিন্তু সেই পুরুষটি আসে না যাকে দেখার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শুধু অপেক্ষায়ই করেছি!

সে এলো না। দিনটি যে আমার কতো কষ্টে কেটে যায় তা হয়তো আমার A জানবে না। কেন জানি না বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠে। মাঝে মধ্যে মনে হয় বুকটাকে চিরে কলিজাটাকে বের করে একটা ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটতে পারলে বোধহয় একটু শান্তি পেতাম।

ইচ্ছে করলেই তো সব কাজ করা যায় না! তাই আমিও মরুভূমির মতো হৃদয় নিয়ে বেচে আছি।

A আমাকে কথা দিয়ে কথা রাখলো না। এলো না আমার বিপদে সাহায্য করতে।

A আমাকে তার প্রথম চিঠিতে লিখেছিল, কিছু কিছু বন্ধু আছে যারা স্বার্থ লাভের জন্য বন্ধু হয়, স্বার্থ লাভের পর কেটে পড়ে, অমন বন্ধু আমার দরকার নেই। আমিও যে তাই চেয়েছিলাম, সে বুঝলো না। ভাবীর কাছে ওকে প্রস্তাব দিতে বললাম, তাও সে পারলো না।

ঈদের দিন সে আমাকে বললো, আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিলে সে আত্মহত্যা করবে, এ কথা আমার আম্মাকে সে বলতে চায়।

আমি কথাটা ভাবীকে বলতে বললে, তখন আর বলে না।

২৪ তারিখে A-কে আবার চিঠি লিখি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো উত্তর পাইনি। আর কোনোদিন তার কোনো চিঠি পাবো কি না তাও জানি না।

জানি না তার চোখে আমার এ লেখাটা পড়বে কি না। তবুও তাকেই বুক ভরা ভালোবাসা উৎসর্গ করবো। আমি যে আজও তারই আছি।

যারা আমার এ লেখাটা পড়বেন, দোয়া করবেন, আমার যেন মৃত্যু হলেও A-কে না হারাই। এই জীবনে যদি সঙ্গী হিসেবে কাউকে পাই তা যেন A-কেই পাই।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

আশ্রয়

– দিলরুবা শাহানা

পৃথিবীতে ধর্ম নিষ্ঠার দিন শেষ, বিপ্লবের দিন শেষ, ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে ওঠার দিন শেষ। এখন জয় জয়কার ব্যবসার। বেচে থাকার জন্য, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ভালোবাসা নামের পণ্যও মানুষ কেনে।

পেশাজীবীর কূটবুদ্ধিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কিছু করতে বাধ্য হয় মানুষ, পরিচয়ও পাল্টায়। তেমনি এই গল্প দুই যুবক জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য খড়কুটোর মতো অদ্ভুত এক ভালোবাসার ডালে আশ্রয় খুজে নেয়। তাদের মরিয়া হয়ে টিকে থাকার লড়াইয়ের সময়েও আপাত ভালো মানুষেরা কিভাবে ফায়দা লুটে নেয় তারও গল্প শোনা যাবে।

অনেক কষ্টে, বহু অপমান সহ্য করে, ধার কর্জ করে মা নাইমকে বিদেশে পাঠান।

নাইম যখন মায়ের গর্ভে তখন বাবা মারা যান। আসলে তাকে খুন করা হয়। কারো চোখে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, কারো চোখে সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত। যিনি নিজের স্বার্থে কণা মাত্র দুষ্কর্ম কখনো করেননি তারই কপালে জুটলো দুষ্কৃতকারী শিরোপা।

নাইমের মাও ভুল পথে চলা, ভুল মতের মানুষের সঙ্গে জীবন জড়ানোর অপরাধে পরিবার থেকে ছিলেন বিতাড়িত।

যা হোক। ব্যাংকে ক্যাশিয়ারের কাজ করে নাইমকে নিয়ে কোনোমতে মা বেচেছিলেন। স্বামীর খুনের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টে জীবন যাপনকারী অসংখ্য মানুষকে সুন্দর জীবন উপহার দেয়ার যে প্রতিজ্ঞা তার ছিল, সে স্বপ্ন তিনি অনবরত দেখতেন তারও মৃত্যু ঘটে যায়।

নাইমকে সবই বলেছিলেন, নিজেদের মত পথ, ভুল কি ভ্রান্তি কোনোটাই বাদ দেননি। অনুরোধ ছিল একটাই বাবা, স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। তবে অন্যের ক্ষতি কখনো করো না, বরং পারলে মানুষের উপকার করো।

নাইম প্রায় বন্ধুহীন মানুষ হয়েছে। গায়ে পড়া মানুষের ডাকাডাকি, হাকাহাকি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কানে না শোনার ভান করে থাকতো।

গুলশান–বাড্ডার সীমান্তে এক পরবাসী ভদ্রলোকের স্ত্রী তিন সন্তানসহ টিনশেডের তিন কোঠার নিজস্ব বাড়িতে থাকতেন। ভদ্রমহিলা নাইমের মায়ের ব্যাংকের গ্রাহক ছিলেন। ওই পরিচয়ের সূত্রেই নাইমরা তাদের ভাড়াটে হয়ে যায়।

বিত্তবানের পাড়া গুলশানের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছিল। ফলে গুলশান সীমান্তবর্তী নাইমদের বাসস্থানও পেয়ে গেল চমৎকার অবস্থান। আগের গলি–ঘুজি সব উধাও। নিজেদের বাড়ির সামনে মোটর চলা গলির দুই বাড়ি পার হলেই বিশাল চওড়া রাস্তা। নাইমের মা হেটেই এখন গুলশান ব্রাঞ্চের অফিস যেতে পারেন। অবস্থানের কারণে জায়গার দামও বাড়লো।

বাড়িওয়ালি নীরবে সঞ্চিত বিদেশি টাকায় বড় বাড়ি তোলার আয়োজন শুরু করেন। নাইমের মায়ের সাহায্যে মহিলার অনেক কাজ সহজ করলেন।

বাড়িওয়ালি ও তার বাচ্চাদের জীবন যাপন অনেক শাদাসিধে ছিল। প্রতিবেশীরা তাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কিছু খুজে পেতো না। ফলে এক রকম নির্বিঘ্ন জীবন ছিল ওদের। সমস্যা বাধলো যখন নির্মাণকারী লোকজনেরা এসে মাপজোক শুরু করলো। আশপাশের লোকজনের চোখ চড়ক গাছ। এতো দিন যাদেরকে পাত্তা দেয়ার মতো মনে করতো না কেউ তারা আজ এমন লোভনীয় জায়গায় পাখির বাসা না ভেঙেই অট্টালিকা বানাবে তা কেমন করে হয়। প্রতিবেশীদের অন্তর্জ্বালার আচ নিরীহ মহিলা ও তার সন্তানদের পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হলো। হিংসুক প্রতিবেশীদের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডাদের মোটা অংকের চাদা দিয়েছিল তবুও রেহাই নেই।

আরেক প্রতিবেশী এক সন্ধ্যায় বাড়ির নকশা পরিবর্তনের অন্যায় দাবি নিয়ে আসে। কারণ তার বাগানে ছায়া ফেলবে নিরীহ মহিলার ইমারত।

মহিলা নম্রভাবেই তার বাড়ির নকশায় বেআইনি কিছু নেই তাই তা পরিবর্তনে তিনি অপারগ বলে জানান।

ওই লোক অশালীন ভাষায় গুণ্ডা দিয়ে তার স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে শাসায়। নাইম তার প্রায় একাকী জীবনের সঙ্গী ক্যাসেট রেকর্ডারে পুরো কথাবার্তা গোপনে রেকর্ড করে। তারপর যে কাণ্ড সে করে তাতে মহিলার নিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

এদিকে নাইম পড়ে তোপের মুখে। পুলিশ, নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা, এমনকি দেশ বিদেশের সংবাদ সংস্থায়ও বিষয়টি আলোড়ন তোলে। সবাই এসে দাড়ায় মহিলার পাশে, সবার হাতে পৌছে গেছে সেই হুমকি সংবলিত ক্যাসেট। আর রেকর্ডকরণেওয়ালাকে হন্যে হয়ে খুজতে থাকে হৃদয়হীন ভাড়াটে খুনীরা।

এমনি এক ভয়ংকর পরিস্থিতিতে নাইমের জীবন বাচানোর তাগিদে আদম বেপারীকে ধরে নাইমকে বিদেশ পাঠিয়ে দেন মা। বাড়িওয়ালি মহিলা শুধু নামাজ পড়েই নাইমের জন্য দোয়া চান না, টাকা পয়সা দিয়েও যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

সত্য তুলে ধরার অপরাধে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় মা বলেছিলেন, তুই আর ফিরিস না বাবা, যদি পারিস কোনোদিন তবে ধার কর্জ শোধের জন্য টাকা পাঠাবি।

বিরাট ঋণ বিদেশের টাকায় শোধ করার বদলে আরো ঋণ, আরো অদ্ভুত শর্তের দস্তখত মেনে নিতে বাধ্য হলো নাইমকে। ছয় সপ্তাহের টুরিস্ট ভিসা শেষ হওয়ার আগেই কি করে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হয় সেই জন্যে একজন নাইমকে দয়ালু, পরোপকারী এক দাড়িওয়ালা ভাইয়ের কাছে নিয়ে যায়। দাড়িওয়ালা ভাইকে মনে হলো আল্লাহর ফেরেস্তা যখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ উপায় একটা বের হবেই।

তবে ওনার পরের বাক্য শুনে নাইম আতকে উঠলো।

দরকার হলে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করিয়ে দেবো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর অছিলাতে যা হবার হবে। টাকা পয়সা যা লাগে আমি দেবো, পরে রোজগার করে শোধ করে দিও।

দাড়িওয়ালা ভাইয়ের কল্যাণে কাজও জুটে গেল। ওনারই ফ্যাক্টরিতে খাবারের কৌটার লেভেল বদলানোর কাজ। সময় গত হওয়া খাবারের কৌটার পুরনো লেবেল ছিড়ে ফেলে ঝকঝকে নতুন লেবেল সেটে দেয়া। ইসরেলের কৌটাজাত আম, ইটালির অলিভ অয়েল, ইনডিয়ার সর্ষের তেল, আরো কতো কি। কাজটা কঠিন নয়, তবে বড় অনৈতিক। স্বল্পভাষী নাইমের সামনে উন্মোচনের আকুতি নিয়ে আরেক অন্ধকার জগৎ এসে দাড়ানো।

নিরুপায় নাইম কাজ করতে করতে দাড়িওয়ালা ভাইয়ের অপেক্ষা করে।

ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার অল্প কয়েকদিন আগেই ভাই এলেন।

নাহ! কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের জন্য মেয়েদের পাওয়া গেল না। ওই ফিলিপিনো মেয়েরা বড় উড়নচন্ডি, কোথায় যে গেছে কে জানে। ইমিগ্রেশন ল'ইয়ারের কাছে নিয়ে যাবো, ও বেটা একটা না হয় আরেকটা পথ বের করবেই। বরিশালের হাকিমকেও নিয়ে যাবো। পরশুদিন তোমরা কাজে আসার পর পরই এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

দাড়িওয়ালা ভাই চলে যাওয়ার পর হাকিমের সঙ্গে কথা হয়।

হাকিম হতভাগা বড় বোনের শ্বশুড়ের যৌতুকের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে নৌকার বৈঠা দিয়ে এমন পিটুনি পিটায় যে, বুড়ো হ্পাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়। সে দেশ ছেড়ে পালায়। এই খানে মাস খানেক ধরে কাজ করছে।

শুনেছে এক ইহুদির সঙ্গে যৌথ মালিকানার ব্যবসা দাড়িওয়ালা ভাইয়ের। হাকিম–নাইমদের মতো অসহায় মানুষকে ঋণের দাস্ততে আটকে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে নেয়। অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকে। কারণ

ইমিগ্রেশনে ধরিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ওদের দাস করে রেখেছে নরমভাষী দাড়িওয়ালা ভাই। ভালো মানুষ দাড়িওয়ালা ভাইয়ের উদার সাহায্যের পেছনে যে মতলব কাজ করে তা কি ভয়ংকর শুধু জানে নাইম ও হাকিমের মতো নিঃসহায়রা।

নাইম তেমন কথাবার্তা বলে না, শোনার কাজটি মনোযোগ দিয়ে করে।

হাকিম দেখলো ওকে কিছু বললে তা পাচ কান হবে না। তখন মন খুলে আরো কিছু কথা বলে। যেমন, জানেন ভাই একটা *জিনিস আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি*। নাইম জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

আচ্ছা ভাই, বলেন তো সৃষ্টির সেরা... একটু থেমে শুরু করলো। ভাবছেন আমি বলবো *জীবন* নাহ। তা নয়, সৃষ্টির সেরা লোভী কে? উত্তর হবে, মানুষ। এটাই আমার আবিষ্কার। দেখেন দাড়িওয়ালা ভাই পুরনো খাবারে নতুন লেভেল লাগিয়ে ব্যবসা করে, তাতে তার নামাজ-রোজা আল্লাহকেও উৎসাহ দেয় না, উৎসাহ জোগায় তার লোভ।

দাড়িওয়ালা ভাই কথা রেখেছেন। ওরা ঠিক সময়ে উকিলের কাছে পৌছে গেল।

উকিলের কথাবার্তা পয়সায় বিকোয়। তাই মূল্যবান আর সংক্ষিপ্ত। সে বলে, দেখো, এ দেশে টিকে থাকার একটাই উপায় আছে তোমাদের *যদি তোমরা নিজেদের গে লাভার (Gay lover বা সমকামী প্রেমিক) ঘোষণা করো। রাজি?*

বাংলাদেশে দুজনকে এই গ্রাউন্ডে কেস করে টিকিয়ে দিয়েছি।

অসহায় দুজন টিকে থাকার তাগিদে ভালোবাসার ওই শাখাতেই আশ্রয় নিল।

মেলবর্ন থেকে

manzur@netspace.net.au

বাবার বিয়ে

– রফিক

কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার দাদা যখন মারা যান তখন আব্বার বয়স চার পাচ বছর। দাদারা ছিলেন দুই ভাই। বড়জন তারও আগে মারা যান।

আব্বার জেঠাতো ভাই একজন। হাজি আমিরুদ্দিন। দাদার মৃত্যুর পর যৌথ সংসারে থাকা আমিরুদ্দিন তার স্ত্রী সন্তানদেরকে নিয়ে আলাদা হয়ে যান। জমি-জমাহীন আমার দাদি যখন তিন তিনটি এতিম সন্তানকে নিয়ে অকূল সাগরে ভাসছিলেন তখন পরিত্রাণ কর্তা হিসেবেই আবির্ভূত হন একজন। তিনি হলেন আমিরুদ্দিন হাজির জামাতা মানে আব্বার ভাতিজি জামাতা ভৈরবের ইউসুফ মোল্লা। মমতা দেখিয়ে আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে তার বড় ভাই তৎকালীন বিখ্যাত ব্যবসায়ী শের আলীর পেয়াজের আড়তে ঠাই দেন।

তাদের পরম স্নেহ আর মমতায় আব্বা ওখানে থেকেই বড় হলেন।

শের আলী ছিলেন ভীষণ কামুক এবং বহুগামী ও ভোগ বিলাসী চরিত্রের মানুষ। সাতটি বিয়ে করেন এবং কয়েক স্ত্রীর গর্ভের এগারো মেয়ে ও আট ছেলের বাবা তিনি। ঊনিশ সন্তানের গর্বিত পিতার দ্বিতীয় সন্তান হলেন আমার আম্মা।

নানা সিদ্ধান্ত নিলেন আমার আব্বাকে জামাতা বানাবেন প্রথম কন্যাকে বিয়ে দিয়ে। মানত ছিল প্রথম কন্যাকে দানে বিয়ে দেবেন।

এদিকে আব্বা স্থির করলেন প্রথমজনকে নয়, বিয়ে করবেন পরমা সুন্দরী আমার আম্মাকে।

এ নিয়ে যখন মন কষাকষি চলে তখন আবার এক সময়ের দরদি ইউসুফ মোল্লা ও তার স্ত্রী আব্বার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। গোপন কলকাঠি নাড়ে আব্বার ওই ভাই আমিরুদ্দিন হাজি। তাদের ধারণা, আব্বা

এ পরিবারে বিয়ে করলে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে যাবেন। তাই সুকৌশলে আব্বাকে বাড়িতে এনে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র বিয়ে করান।

শুনেছি নদী থেকে পানি আনতে গিয়ে পিচ্ছিল রাস্তায় পা পিছলে পড়ে মাটির কলসটি ভাঙার দরুণ রাগ করে আব্বা তাকে তালাক দেন বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মাথায়।

ওদিকে নানা তার প্রথমা কন্যাকে যথেষ্ট জাকজমকের সঙ্গে বিয়ে দেন নিজ গ্রাম কমলপুরেই। আমার আম্মা তখন কিশোরী। আট নয় বছরের হবেন। নানাজান তার ভাইয়ের কূটবুদ্ধিতে কান না দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন আব্বার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাবেন।

আব্বার মামাবাড়ির সম্পর্কে আমার নানারাই ছিলেন নিকট আত্মীয়। এই সুবাদে আব্বার মামাদের নিত্য যাতায়াত ছিল ওখানে।

অবশেষে নানা সকল জল্পনা–কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করলেন।

বিয়ের দিন বরযাত্রীতে উঠান ঠাসা। এমন সময়ে যে কেন একজন রসিকতা করে বললেন যে, বৌ না দেখেই বিয়ে করাতে এলাম। কানা, নাকি খোড়া তা তো যাচাই করা দরকার।

পুরনো আত্মীয়তার সূত্রেই যাতায়াতের প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমার কিশোরী মাকে তখন অন্দর মহলে বিয়ের সাজে সাজাতে ব্যস্ত বাড়ির মহিলারা। নানা ঠাট্টা শুনে দৌড়ে ভেতরে গিয়ে বিয়ের শাড়ি পরা অবস্থাতে ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সোনার অলংকারে ভরা আমার কিশোরী মাকে পাজা কোলে করে বাইরে এনে সকলে ঘিরে বসা মাঝখানের উচু টেবিলে দাড় করিয়ে শাড়ির আচলে ধরে টানছেন আর মা নতর্কীদের মতো ঘুরছেন। এক টানে বারো হাত শাড়ি পুরোটা আমার নানার হাতে। মায়ের পরনে আছে ব্লাউজ এবং পেটিকোট। তাছাড়া দশটি ছিদ্রযুক্ত দুই কানে, মাথায়, নাকে। কোমরে এবং পায়ে সোনার গহনাগুলো শোভা পাচ্ছে।

অতঃপর নানাজান লাফ দিয়ে টেবিলে উঠে মাকে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার পাশের লোকজনকে দেখাচ্ছেন এবং দম্ভের সঙ্গে প্রশ্ন করছেন, বলো তোমাদের আরো কিছু দেখার বাকি আছে কি না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে থ হয়ে গেলেন।

এরপর নানাজান আদেশ করলেন, আমার আম্মা যেন নিজে নিজে নেমে হেটে হেটে ঘরে যান।

আমার পরমা সুন্দরী মায়ের মুখে ছোটকালে ঘটনাটি শুনে হাসতাম। এখনো মনে হলে বড্ড হাসি পায় আমার নানার খামখেয়ালিপনার কথা ভেবে।

আমার রসিক নানা প্রয়াত হয়েছেন প্রায় পচিশ বছর। এক সময়ের নামকরা ব্যবসায়ী আমার নানাবাড়ির জৌলুসও আজ বিস্মৃত প্রায়। আট মামার সাতজনই বলতে গেলে বেওয়ারিশ। একমাত্র রশিদমামা ও তার স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রাইমারি শিক্ষকের চাকরি পেয়ে দুজনেই কমলপুর আদর্শ প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে নানার নামটা ধরে রাখছেন।

আমার আম্মার চলমান কাহিনী বলবো? যে মা তার প্রথম জীবনে পালংকে শুয়ে বসে রানীর হালে কাটাতেন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ নিরাভরণ হয়ে ছোট্ট এক জীর্ণ কুটিরে হাড় জিরজিরে রুগ্ন শরীরে নিদারুণ কষ্টে বৈধব্য জীবন কাটাচ্ছেন। তার কাছে পালংক এখন অতীত ইতিহাস মাত্র। সংসারের ঘানি টেনে অবস্থা কাহিল।

পোড়া কপালে আমরা দুটি ভাই বৃদ্ধ মাকে অবশ্যকরণীয় কিছুই করতে পারছি না। অভাবের সংসারে বরং আমরাই যেন মায়ের মাথার বোঝা হয়ে ওনার কষ্টকে বাড়িয়ে দিচ্ছি। মায়ের বর্তমান মুখশ্রী দেখে কল্পনাই করা যাবে না এই সেই মা আমার যার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমার প্রয়াত বাবা তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে গর্ভধারিণী আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন।

সময়ের ব্যবধানে পারিপার্শ্বিকতাকে মেনে নেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। বাস্তবতাকে স্বীকার করেই মা আমার আজও বেচে আছেন।

আলগী, রায়পুরা, নরসিংদী থেকে

শোভাদি

- মুশতাক আহমেদ

অফিস কর্তৃপক্ষ আইন করেছে দুই বছরের জন্য ব্যাংকের অন্য শাখায় বদলির। আইন ভঙের শাস্তি ভবিষ্যৎ পদোন্নতি বন্ধ। ঢাকা থেকে খুলনা। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বড় মেয়েটি সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হলো। অন্যারা বিভিন্ন ক্লাসে পড়ছে। স্কুল কলেজে ভর্তির সমস্যা। তাছাড়া আর্থিক সমস্যা তো রয়েছেই।

তবুও শেষ পর্যন্ত খুলনায় আসতে হলো। এসে প্রথম কাজ ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করানো। মেয়েকে নিয়ে একদিন কলেজে গেলাম। এই সেই কলেজ যার প্রাঙ্গণ, ছাত্রী নিবাস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি জিনিস আমার পরিচিত। ফিরে গেলাম পচিশটি বছর পেছনে। ফেলে আসা দিনগুলো মুহূর্তের জন্য সোনালি হয়ে দেখা দিল আমার মনে। ছাত্রী নিবাস সংলগ্ন লম্বা নারিকেল গাছগুলো আমাকে স্বাগত জানিয়ে পচিশটি বছর আগের স্মৃতি রোমন্থনে সাহায্য করলো। আমার সেদিনের অপরিপক্ব আবেগের নীরব সাক্ষী ওরা। আনমনে চেয়ে রইলাম ওদের প্রতি। হারিযে গেলাম স্মৃতির গহীন অরণ্যে।

বাবা, তুমি এগোচ্ছ না কেন? মেয়ের তাগাদা।

ওর কাছে অপ্রস্তুত হলাম।

এগিয়ে গেলাম অধ্যক্ষার রুমের দিকে। দরজায় পুরু দামি পর্দা। ঝুলছে। নাম-ফলকে অধ্যক্ষার নাম দেখে চমকে উঠলাম। এ কি? এ নাম তো আমার চিরচেনা। এ নামটি নিয়ে কল্পনার জগতে কতো বিচরণ করেছি, কতো কল্পনার জাল বুনেছি, কতো স্বপ্ন দেখেছি। এ নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার জীবনের বেদনাময় এক অধ্যায়। সামনে এগুবো কি পেছনে যাবো বোঝার আগেই কখন পৌছে গেছি অধ্যক্ষার রুমের সামনে।

ভর্তিচ্ছু ছাত্রীরা সাক্ষাত যথারীতি সম্পন্ন হবার পর অভিভাবকের পালা। কিন্তু নিয়মভঙ্গ করে ছাত্রীর ডাক পড়লো।

দশ মিনিট পরে কন্যাটি হাসি মুখে ফিরে এসে বললো, বাবা, অধ্যক্ষা আপা, কাকিমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক কথা হলো।

প্রমাদ গুণলাম। আমাকেসহ অধ্যক্ষার কাছে যাবার ডাক পড়লো। পিতাপুত্রী রুমে ঢুকলাম। দেখলাম দরজার পর্দার চেয়েও অধিক পুরু লেন্সের চশমা চোখে, হালকা গোলাপি শাড়ি পরনে পঞ্চাশঊর্ধ ছোটখাটো শ্যামলা ভদ্রমহিলা।

আমাকে ইশারায় সোফা দেখিয়ে দিয়ে মেয়েকে গম্ভীর স্বরে বললেন, মা, তুমি অফিস রুমে গিয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র বুঝে নাও।

আমার কন্যা রুম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি শেলফের দিকে মাথা নিচু করে বইপত্র খুজলেন।

মুহূর্তে ফিরে যাই আমার পচিশ বছর আগের হারানো দিনগুলোতে। মনে পড়লো যার কথা কলেজ ছুটিতে বাড়ি এসে ভাবী গল্প করতেন, এই সেই শোভাদি, ভাবীর হস্টেলের রুমমেট। ভাবীকে শোভাদি গান শোনাতেন, চুল বেধে দিতেন, নোট করে দিতেন, এক সঙ্গে ছবি দেখতেন, শাড়ি অদল-বদল করে পরতেন, আরো কতো কি! ভাবী ফোর্থ ইযারে, শোভা দি থার্ড ইয়ারে আর আমি সেকেন্ড ইয়ারে। কৌতূহল বশে শোভাদির নানান কথা শোনার জন্য ভাবীকে বিরক্ত করেছি। শোভার চেহারা, চাল-চলন, পছন্দ-অপছন্দ

ইত্যাদি শুনতে শুনতে খাটো-মতো শ্যামলা মেয়েটিকে না দেখেও তার ছবি মনের মাঝে একে ফেলেছিলাম। আমার মন শোভাভক্ত হয়ে ধীরে ধীরে শোভাময় হয়ে উঠলো।

মনে পড়লো শোভার গল্প শুনে ভাবীকে প্রথমে চিঠিতে লিখেছিলাম, ভাবী, তোমার রুমমেট শোভাদিকে আমার সালাম দিও। তার কথা আরো শুনতে ইচ্ছে করে।

শোভাদি আলাদা চিঠি দিয়ে আমাকে লিখেছিলেন। আমাকে তো কেউ সালাম দেয় না, তুমি কেন দিলে? আমার এমন কি কথা শুনতে ইচ্ছে করে?

সেই থেকে...। এরপর তাকে দেখেছি, তাকে নিয়ে পার্কে বেড়িয়েছি। সিনেমা দেখেছি, ছবি তুলেছি।

পরীক্ষায় ফেলের খাতায় নাম উঠলো। জীবনটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেল। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। হঠাৎ শোভাদিকে হারিয়ে ফেললাম। পচিশটি বছর ধরে শোভাদিকে মনে মনে খুজেছি। আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসার এভাবে মৃত্যু হয়েছিল।

খুট করে একটু শব্দে আমার তন্ময় ভাঙলো। দেখলাম শোভাদি টেবিলে মাথা গুজে রুমালে মুখ ঢেকে আমার সামনে। কোনো কথা হলো না। শুধু কয়েকটা সোনাঝরা মুহূর্তের জন্য দুজনেই দুজনকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখি। রুম থেকে কখন বের হলাম খেয়াল নেই। শুধু লক্ষ্য করলাম শোভাদির চশমার পুরু কাচ অশ্রুসিক্ত, আমার চশমার কাচও শুষ্ক ছিল না।

ভাবীর কোনো ভাই ছিল না। আর আমি শিশুকালেই মা-বাবাকে হারিয়েছি। স্বভাবতই সব স্নেহ জড়িয়ে আমি ছিলাম তার ছোট্ট ভাইটি। *শোভা শোভা* করে ইচড়েপাকা অপদার্থ ছোট্ট ভাইয়ের ক্ষতির সম্ভাবনায় তার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় ভাবী কৌশলে শোভাদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। দুটি নবীন হৃদয়ে যে মাধুর্যের বীজ অংকুরিত হয়, যৌবনে এসে তা পুষ্পে পল্লবে বিকশিত হলো না। সে মাধুর্য আজ হঠাৎ দোলা দিয়ে বাকি জীবন বেদনাময় করে তুললো সে কথা ভাবী জানলেন না।

পূর্ব শেওড়াপাড়া, ঢাকা থেকে

আদিতা

– জয়জিতা সরকার নূপুর

আদিতার কথা শুনে অপু তো হেসেই খুন। ও নাকি দেখতে এ আর রহমানের মতো।

কিন্তু আমি তো মিউজিশিয়ান নই।

অপু হাসতে হাসতে বললো, সে তো আমি। দেখো, শুধু বলেছি তোমার মুখে ওর ছায়াটা পড়ে।

তাহলে আদিতা, কিবোর্ডটা আমাকে শিখিয়েই দাও এবার। একটু পাগল হয়ে যাই।

কে বলেছে তোমায়, কিবোর্ড বাজাতে জানলে মানুষ পাগল হয়ে যায়?

আদিতা কিবোর্ড থেকে হাত উঠিয়ে অপুর দিকে তাকালো। কি সুন্দর ওর হাসি! এতো সুন্দর করে কথা বলে ও। সেই দুপুর দুটা থেকে অপু স্টুডিওতে এসে বসে আছে। তখন রিদম অ্যারেঞ্জের কাজ চলছিল। এগুলো হার্ড ডিস্কে ওঠানো হয়ে গেছে। কিবোর্ড দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গিটারিস্ট, বেহালাবাদক, তবলচি এসে পড়বেন।

অপু, বোর হচ্ছো না তো? আদিতা ওকে জিজ্ঞাসা করলো। কোক খাবে?

কিছু না। অপু বললো।

কোক খাও। এতো গরম! এসিটাও নষ্ট হয়ে আছে। মনে হচ্ছে হিট স্ট্রোক হবে। আমি বরফ ঠাণ্ডা কোক খাবো। চলো।

অপুকে নিয়ে স্টুডিও থেকে আদিতা বের হয়ে এলো।

গান কখন রেকর্ড করবে? অপু ওর পাশাপাশি হাটতে হাটতে জিজ্ঞাসা করলো।

এই তো রাত নয়টার ভেতর সিঙ্গার চলে আসবেন। আদিতা আসলে কথা বলার মাঝে কোনো ছন্দ খুজে পাচ্ছে না।

অপু কি শান্ত কি মায়া ওর মাঝে।

আদিতা ভেবেই পায় না ওর সঙ্গে কোন ব্যাপার নিয়ে কথা বলবে। ওর গানের সুরগুলো যেন ওকে উদ্দেশ্য করেই করা। এক মাস হলো ওদের পরিচয়। এরই মাঝে খুব বন্ধু হয়ে গেছে ওরা। কিন্তু বন্ধুত্বে মধ্যকার দুরত্বটা আদিতাকে অস্থির করে তুলেছে।

কি ভাবছো?

আচ্ছা, তুমি আমার জন্য কি করতে পারো? আদিতা ওর দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় জানতে চাইলো।

তোমার বার্থডে-তে উইশ করতে পারি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কক্সবাজার যেতে পারি। তোমাকে কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়াতে পারি। আরো অনেক কিছু করতে পারি। বলো কি করতে হবে?

ও। আদিতা আশাহত গলায় বললো, ভেবেছিলাম তুমি আমার জন্য সব করতে পারবে।

অপু মাথা নিচু করে রইলো।

ওরা একটা ফাস্ট ফুড শপে ঢুকলো। পছন্দ মতো খাবার ট্রে-তে করে নিয়ে একেটা টেবিলে গিয়ে বসলো।

তুমি জানো আদিতা, আমি চার কামড়েই একটা বার্গার সাবাড় করতে পারি। আর এক নিঃশ্বাসে আধ লিটার কোক।

তাই নাকি?

এই দেখো। বলে চার কামড়েই অপু বার্গারটা শেষ করলো।

আদিতার হাসি থামেই না। ও হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর গলার চেইনটা অপুর গলায় পরিয়ে দিল। অপু অনেক চেষ্টা করেও ওকে ফেরাতে পারলো না। ওর সুন্দর নীল খাদি ফতুয়ার খোলা বাতামে চেইটা খুব মানিয়েছে অপুকে।

এবার তাহলে কোকটা শেষ করি?

ওটা আরেকদিন করো। আজকে সঙ্গে আর কিছু নেই তোমাকে দেবার মতো। আদিতা বার্গারে কামড় বসাতে বসাতে বললো।

কিন্তু আমি তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা জিনিস তোমার কাছে দিব্যি রয়ে গেছে। অপু দুষ্টু হেসে বললো।

আদিতা অনেক খোজাখুজি করেও কিছু বের করতে পারলো না। মোবাইলে সময় দেখে নিয়ে ব্যস্ত ভঙিতে বললো, চলো উঠি।

অপু ওকে ওর মিউজিক স্টুডিওতে পৌছে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে। গিটার, তবলা, বেহালা, কণ্ঠ এসব নিতে হবে। তারপর তো মিক্সিং রয়েই গেছে। ওহো। অপু ওর ব্যাগটা ফেলে গেছে। কম্পিউটার ডেস্কের ঠিক নিচেই ম্যাটের ওপর রাখা আছে। আদিতা কি ওকে ফোন করবে? ও নিচু হয়ে ব্যাগটা হাতে নিল। ছোটখাটো সুন্দর হালকা একটা নীল ব্যাগ। আর সময় নিল না আদিতা।

হ্যালো, কে বলছেন?

স্পেশাল এজেন্ট অফ ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ।

তাই? অপু ছন্দ ভরা একটা হাসি দিল।

স্যার, আপনার ব্যাগটা রেখে গেছেন।

ও। তাই তো বলি কি জানি ফেলে এসেছি।

শুধু ব্যাগ, আর কিছু নয়?

কি জানি।

অপু বললো, আমি আসছি।

আদিতা কম্পিউটারের সামনে ঝুকে কাজ করছে। অপু দরজা ঠেলে ঢুকতেই আদিতা ওকে ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললো। রুমে ইন্সট্রুমেন্টস, চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। সবাই যার যার কাজ শেষ করে চলে গেছে। ঘরে শুনশান নীরবতা।

আদিতা কাজে এতো ব্যস্ত যে অপু একটু বিরক্ত বোধ করছে। ও উঠে এসে আদিতার ঠিক পেছনে গিয়ে দাড়ালো। একটু ঝুকে চেয়ারে বাসা আদিতার কানে কানে বললো, আমি কি চলে যাবো?

আদিতা এতো ব্যস্ত ছিল যে চমকে উঠলো।

কেন? আমি চা দিতে বলছি। আদিতা উঠে দাড়ালো।

অপু বাধা দিয়ে বললো, থাক না।

কেন? অদিতা বললো।

অপু ওর কথায় কানই দিল না। ওর ছেড়ে দেয়া চুলগুলো নাড়িয়ে দিয়ে বললো, তোমার ভয় করছে না?

আদিতা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, কেন?

যদি তোমার কিছু নিয়ে যাই। অপু একটু রহস্য করলো।

আদিতা কি বলবে বুঝতে পারছে না। ওর বুকে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গত এক মাসের অস্থিরতা, একটা পরিচিত মুখ আর ওর অবচেতন মনের চাওয়া সব কিছু মিলিয়ে একটা জটিল ধাধা ওর মাথায় ঘুরছে। আদিতা দাড়িয়ে আছে। ওর টানা টানা চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। ওতো এক মুহূর্তও অপু ছাড়া কিছু বোঝে না। ঘুমুতে যাবার আগে অপু, ঘুম ভাঙার পর অপু, কথায় অপু, সুরে অপু, শুধু অপু এবং অপু। আদিতা আর দাড়িয়ে থাকতে পারছে না। সমানে কাপছে।

অপু হাতে ধরে ওকে চেয়ারে বসালো।

দুর বোকা, আমি তো মজা করছিলাম। এতো সুন্দর একটা চেইন দিলে, এরপর তোমাকে কিছু না দিয়ে কি আমি কিছু নিতে পারি? বোকা মেয়ে। অপু ওর সামনে হাটু গেড়ে বসে ওকে কথাগুলো বললো।

আদিতা চুপচাপ এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর নিজেকে খুব ছোট লাগছে। ও কি এতোই অযোগ্য, অপু ওকে নিয়ে এভাবে মজা করছে সারা দেশের মানুষ ওর জন্য পাগল আর ওর সামনে বসে থাকা এই ছেলেটি ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না। ও মাথা নিচু করে রইলো।

অপু ওর ব্যাগটা কাছে টেনে নিল। ভেতর থেকে একটা ফ্লপি বের করে আদিতা হাতে দিয়ে ওটা চালাতে বললো।

আদিতা ওটা চালিয়ে দিল। কম্পিউটার স্কৃনে সুন্দরভাবে একটি লেখা ফুটে উঠলো,

ADITA
I miss you
I need you
I love you

আদিতা আর চোখে জল ধরে রাখতে পারলো না। জোরে কেদে উঠলো।

অপু হাতে ধরে দাড় করিয়ে আদিতাকে বুকে টেনে নিল।

চট্টগ্রাম থেকে

আত্মগ্লানি

মানুষের জীবনে এমন ভুল থাকে যা শোধরানো যায় না।

আমি তখন অষ্টাদশী। দুরন্ত কিশোরী মেয়ে থেকে সবে যুবতী হয়ে ওঠা এলোমেলো যুবতী। কারণ তখন হৃদয়ে অযথা দক্ষিণা হাওয়া আমার সত্তাকে এলোমেলো করে দিতো।

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি একটি লম্বা শ্যামলা ছেলে আমাকে ফলো করছে। এভাবে কতোদিন কেটে গেলে আমার মনেও পুলক লাগলো। রোমাঞ্চিত হলাম অজানা আনন্দে।

একদিন ছেলেটি আমার সামনে এসে বললো, আমার নাম রিপন। তোমাকে আমার ভালো লাগে। যদি তুমি আমাকে বন্ধুত্বের সুযোগ দাও তাহলে কাল সকাল দশটায় কলেজ গেটে থাকবে। এই বলে হাতে ফুল দিয়ে চলে গেল।

শুরু হলো মনে ঝড়ের দাপাদাপি। অজানা সুখে শিহরিত হই বার বার। সিদ্ধান্ত নিলাম রিপন নামের ছেলেটির সঙ্গে দেখা করবো।

পরদিন সকাল দশটায় রিপন আমাকে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করলো।

এরপর জানাশোনা, ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা। সময় গড়িয়ে চললো। প্রায়ই আমরা বেড়াতে যেতাম।

এরই মাঝে কেটে গেল দুটি বছর। ও গল্প করতে করতে আমার শরীর ছুতে চাইতো। কিন্তু কুমারী মেয়ে হিসেবে এসব বিষয়ে ভীতি ছিল।

একবার রিপন বুদ্ধি করে ওর বন্ধুর ফাকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

আমি ভয়ে কুকড়ে যাই। ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিই এবং বলি, এসব পছন্দ করি না।

রিপন বলে, কেন করো না। প্রেম করতে গেলে একটু আধটু এসব হয়েই থাকে।

বললাম, বিয়ের পরে সব, এখন নয়।

বাড়িতে অবিবাহিত মেয়ে থাকলে বাবা যেমন মেয়ের বিয়ের জন্য তৎপর হয় তেমনি ঘন ঘন ঘটকের আগমন ঘটে। ফলে রিপনকে বলি, তাড়াতাড়ি কিছু একটা করো। বাবা–মা, ভাইরা কখনোই আমাকে বেকারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

রিপনের সামনে মাস্টার্স পরীক্ষা। আমি দিশেহারা হয়ে শুধু চিন্তার সাগরে অবগাহন করি।

হঠাৎ একদিন বিকেলে পাত্রপক্ষ আমাকে দেখতে এসে পছন্দ হওয়ায় আংটি পরিয়ে বলে ওঠে, কাজি ডাকুন, আজ রাতেই বিয়ে।

রিপন পালিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেও বাবা মায়ের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে চুপচাপ কবুল বলে নতুন জীবনে প্রবেশ করি।

বাসর রাতেই স্বামী আমার কুমারীত্ব হরণ করে।

শ্বশুর বাড়িতে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার স্বামী প্রচণ্ড রাগী ও বদমেজাজি। যখন ভালো থাকে তখন ফেরেশতা আর রাগ করলে শয়তান। নানান নিয়মের বেড়াজালে খুবই মনঃকষ্টে ছিলাম।

একদিন সামান্য কারণে আমার স্বামী আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে।

রাগ করে আমি বাপের বাড়ি চলে যাই।

বাবা–মা, ভাইদের কাউকেই কিছু বলিনি। শুধু দীর্ঘশ্বাস আমার মনের জানালায় কষাঘাত করে।

একদিন ভাবীর সঙ্গে মার্কেটে যাই। কিন্তু মাথা ব্যথার কারণে ভাবীকে মার্কেটে রেখেই রিকশা করে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তায় রিপনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো?

ভালো। হয়তো আমার মুখ দেখে সে কিছু অনুমান করে থাকবে।

বললো, তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে চলো কোথাও বসি।

রিপনের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলতে বাধ্য থাকি।

হঠাৎ রিপন দাড়িয়ে বললো, শোনো, তোমার শ্বশুর বাড়ির কেউ দেখলে তোমার সমস্যা হতে পারে। তারচেয়ে চলো আমার এক বন্ধুর বাসায় যাই।

কিছুই বললাম না। কেন যেন তখন মনে হচ্ছিল, রিপনকে বিয়ে করলে অনেক সুখী হতাম।

বন্ধুর বাসায় পৌছে রিপন আমার কষ্টের কথা শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। কিভাবে কখন যে আমরা দুজন দুজনার মাঝে বিলীন হয়ে গেছি বুঝতেই পারিনি।

যখন বুঝলাম তখন আত্মগ্লানিতে ছুটতে ছুটতে চলে আসি।

আমার শ্বশুর আমাকে অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান শ্বশুরবাড়িতে।

স্বামীও অনেক কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

সুখেই কাটছিল দিনগুলো। একদিন অনুভব করলাম শরীরে নতুন প্রাণের অস্তিত্ব। বাড়িতে খুশির বন্যা। নয় মাস পরে জন্ম নিল আমার মেয়ে। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে আর আমি রিপনের প্রতিকৃতি দেখছি। এবং অনুশোচনায় শেষ হয়ে যাচ্ছি। স্বামীকেও সব খুলে বলতে পারছি না। কারণ আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে, মেয়েকেও প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিভাবে আমি এই নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তবকে স্বীকার করি? এভাবে কতো দিন, কতো বছর, কতো যুগ আত্মগ্লানি, অনুশোচনায় নিঃশেষ হবো জানি না।

নাম ঠিকানা বিহীন

চুল

– নয়ন জাহাঙ্গীর

ভালোবাসা কি? এই চিন্তায় কাটিয়ে দিলাম পচিশটি বছর। অতঃপর একদিন খেয়াল করলাম, নানান চিন্তার ঘুরপাকে পড়ে মাথার চুল আস্তে আস্তে কখন যেন ফাকা হয়ে গেছে! সময়ের চক্করে জীবনের প্রথম ভালোবাসার উপলব্ধি হলো চুলের প্রতি। তখন বুঝতে পারলাম ভালোবাসাটা আসলে কি জিনিস।

হ্যা, প্রত্যেক মানব–মানবী যখন এই গোল্ডেন সময়ে প্রেম ভালোবাসা নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে একের পর এক দিন পার করে দিচ্ছে তখন আমি চুলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে চলেছি বিভিন্ন প্রকারে। যখন মানব–মানবী ভালোবাসা টিকিয়ে রাখার জন্য যতো প্রকারের ছলচাতুরি আছে তার সব প্রয়োগ করা নিয়ে ব্যস্ততায় সময় কাটাচ্ছে তখন আমি চুল ঝরে পড়া রোধ করতে এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা প্রয়োগ করতে বাকি রাখছি। যখন যে যা উপদেশ দিয়েছে তখনই সেটা প্রয়োগ করা চাই। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি থেকে শুরু করে নানান প্রকার তেল, সেই সঙ্গে পানি পড়া, তেল পড়া, ভেষজ মিশ্রণ সবই চুলের প্রতি ভালোবাসা জানাতে প্রয়োগ করা হলো। কিন্তু হায়! আমার চুল আমার মনের বেদনা বুঝলো না। একদিন মাথাকে সাহারার মরুভূমি করে তার প্রতি আমার ভালোবাসাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চিরজীবনের মতো ছেড়ে চলে গেল। চুলের প্রতি সর্বশেষ আমার ভালোবাসা এতো প্রবল রূপ নিল যে, ভয়ে আয়নায় মুখ দেখা বন্ধ করে দিলাম পাছে আরো দুঃখ বাড়বে বলে।

এখন সেলুনের বড় বড় গ্লাসে যখন মাথার প্রতিবিম্ব দেখি তখন দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে বেদনায়। তখন বুঝতে পারি ভালোবাসা কাকে বলে! মাঝে মধ্যে বন্ধুরা কাটার ওপর লবণের ছিটা দিয়ে আমার চুল নিয়ে যখন নানান প্রকারে কটূক্তি করে তখন বুকের পাজরের নিচে যে ব্যথা অনুভব করি সেটা তারা বুঝতে পারে না। পারলে তারা বুঝতো চুলের প্রতি আমার ভালোবাসা কতো গভীর ছিল।

এ বছর গোল্ডেন জুবিলি পার হয়ে সিলভার জুবিলিতে পদার্পণের মধ্যে দিয়ে *ভালোবাসা দিবস* উদযাপন করবো। আর বন্ধু-বান্ধবদের দেয়া *টাক্কু* খেতাব নিয়ে ততোদিন বেচে থাকবো যতোদিন না দীর্ঘল কালো কেশের কোনো রমণী এসে আমার টাক মাথাটি তার সেই কেশ দিয়ে ঢেকে দেয়ার প্রয়াসে আমাকে জীবন সঙ্গী করার জন্য হাত বাড়িয়ে না দেবে।

আজ ভালোবাসা দিবসে দীর্ঘশ্বাসের পুনরাবৃত্তি না করে, ক্ষোভ, আক্ষেপ, বেদনা মনের মাঝে না জাগিয়ে তাকে শুধু একটাই প্রশ্ন করবো, *তুমি কেন এতো তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে?*

নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

বনসাই

তার ক্যাকটাস খুব পছন্দ।

একবার ব্যাংককে যাবার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার জন্য কি আনবো?

সে জিজ্ঞাসা করলো, সত্যি সত্যি বলবো?

বললাম, হ্যা, অবশ্যই।

বললো, আনতেই যদি চাও তবে ক্যাকটাস এনো, আই লাভ ক্যাকটাস।

বললাম, কেন ক্যাকটাস তোমার এতো ভালো লাগে?

এটাকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না এটার রিপ্রডিউস করার এতো স্ট্রাইকিং ক্ষমতা। এর ভেতরের পোটেনশিয়াল বোঝা যায় না। এটিতে কখনো ফুল ফুটতে পারে বিশ্বাস হয় না। যখন এটিতে ফুল ফোটে, খুব ভালো লাগে।

বললাম, ক্যাকটাস বাচানো খুব কষ্ট, একটু অযত্ন করলেই মরে যায়।

সে বললো, ক্যাকটাসের কোনো যত্নই লাগে না ঠিক আমার মতো। সপ্তাহে একবার পানি দিলেই হলো।

মনে মনে বললাম, আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তোমাকে অযত্ন করলে চিরদিনের জন্য হারাতে হয়। সে জন্যেই তো তোমার যত্নের কোনো ত্রুটি করি না।

এ কথাটা এ জন্যই বললাম, কারণ তাকে বহুদিন আগে তার একটি চাকরির জায়গা থেকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। পরে ভুল বুঝতে পেরে তাকে বহুবার সেখানে যাবার জন্য বলা হলেও তাকে আর কোনোদিন সে জায়গায় নেয়া যায়নি।

ব্যাংকক থেকে তার জন্য ক্যাকটাস এনে দিলাম।

খুব খুশি হলো। নিজের সন্তানের মতো যত্ন করতে লাগলো। প্রতি বৃহস্পতিবার পানি দেয়।

যদি জিজ্ঞাসা করি, পানি দিয়েছিলে তো?

বলে, হাউ ডু ইউ থিংক আই উইল ফরগেট দ্যাট?

মনে মনে ভাবি, ক্যাকটাস হয়ে জন্মালেই ভালো হতো।

একদিন তাকে বলেছিলাম, তোমার বনসাই ভালো লাগে না? আমার খুব ভালো লাগে।

একবার টোকিওতে বেড়াতে গিয়ে *টবু ওয়ার্ল্ড স্কয়ার*-এ গিয়েছিলাম। পৃথিবীর সমস্ত দর্শনীয় জিনিসগুলোর ছোট্ট সংস্করণ আছে সেখানে। অপূর্ব লাগে! বনসাই দিয়ে ঘিরে রিয়ালিস্টিক করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সে বললো, না, আমার বনসাই ভালো লাগে না, দেখলে কষ্ট হয়। একটা বটগাছ যেটির ডালপালা ছড়িয়ে প্রকাণ্ড হবার কথা ছিল তাকে টবে বন্দী করে রাখা হয়েছে, বাড়তে দেয়া হয়নি। না, ওগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে না, বড় কষ্ট হয়।

সেদিন তার এ কথা শুনে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছিলাম। অথচ আজ ভাবি, সে জানে না সেই-ই একটা বনসাই হয়ে গেছে। এখন তাকে দেখেই আমার কষ্ট হয়। দিনের পর দিন সে তার ইচ্ছার শেকড়গুলোকে

নীতির শক্ত তারে বেধে রেখেছে, তাদের বাড়তে দেয়নি। তাই তার সে ইচ্ছা, সে স্বাধীনতার সাধ, ডালপালা ছড়াতে পারেনি। সে বনসাই হয়ে গেছে।

তাকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে চেয়েছিলাম, তার ইচ্ছার ডালপালাগুলোকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, সূর্যের আলোয় তার পাতাগুলোকে সবুজ করতে চেয়েছিলাম। সে সবুজ হতেও পারেনি। কারণ তার শেকড় যে বড় কঠিন নীতির তারে বাধা।

সে যে বনসাই!

নাম ঠিকানা বিহীন

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

- জেড. ইউ আহাম্মদ

তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল নাটকীয়ভাবে। সে কথা না হয় অজানাই থাকলো।

তার নাম রেখেছিলাম কবিতা। আমরা একই ডিপার্টমেন্টে পড়তাম। কিছুটা দেরিতে হলেও জানতে পারি, সে আমার দুই বছরের সিনিয়র। এরপর থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করি। সম্বোধন করি আপা বলে।

ততোদিনে তিনি আমাকে ভিন্ন নামে ডাকতে শুরু করেছেন। তিনি আমাকে আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেন।

বুঝেও না বোঝার ভান করি।

একদিন আমাকে একান্তে পেয়ে বললেন, পুরুষের লোমশ বুক আমার খুব ভালো লাগে। আমার হাত টেনে তাতে লিখে দিলেন, Kiss me।

বিব্রত বোধ করলাম। আমার হাত তিনি তার বুকে চেপে ধরলেন।

অজানা আনন্দে শিহরিত হলাম।

এরপর থেকে তার দৌরাত্ম ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তার হাতের পুতুল হয়ে গেলাম।

একদিন বললেন, আজ বাসায় কেউ নেই, বাসায় চলো। রিকশা ডেকে অনেকটা জোর করেই তুললেন রিকশায়।

বাসায় গিয়ে তিনি যেন মাতাল হয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি তার জামা খুললেন। আমাকে বললেন, তার ব্রা-র হুক খুলে দিতে।

এরপর তাকে জড়িয়ে ধরে খাটে শোয়ালাম।

প্রায় প্রতিদিনই আমাদের মিলন হতো। তিনি ক্রমেই বেপরোয়া হলেন।

আমিও আমার লেখাপড়া একেবারে শিকেয় তুললাম।

একদিন আমাকে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। আজ তাকে অন্য রকম লাগছে। কথা বলছেন মেপে মেপে। বললেন, দেখো জীবনটা উপভোগ করার জন্য। আমরা জাস্ট এনজয় করেছি। সময় তো বসে থাকে না। আগামী সপ্তাহে আমার বিয়ে, পাত্র ইঞ্জিনিয়ার। এরপর একটি কার্ড আমার হাতে দিলেন।

ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছুই বলতে চাইলাম।

তিনি আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠলেন।

উদভ্রান্তের মতো চেয়ে রইলাম।

এরপর দশ বছর কেটে গেল। চাকরি সূত্রে এখন আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। নতুন বাসা খুজতে গিয়ে এক বাড়িতে ঢুকেছি। এক মহিলা বলে উঠলো, অমিত না!

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কারণ কবিতা ছাড়া কেউ আমার এ নাম জানতো না। দ্রুত সেখান থেকে চলে আসতে চাইলাম।

তিনি পথ আগলে দাড়ালেন। বললেন, প্লিজ শোনো।

জানলাম তিনি বিধবা।

অনেক কান্নাকাটি করলেন, ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন। এখন তিনি প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। স্বপ্ন দেখান নতুন জীবনের।

পালিয়ে বাচার চেষ্টা করি। কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চলবে? জানি না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

প্রেমের চিরন্তন বাণী বর্তমান যুগে

- রাজু

কাছে টানো	:	লোভ দেখিয়ে।
বিশ্বাস করো	:	না করাই ভালো।
প্রেম করো	:	ওয়ানটাইম ইউজ।
কথা বলো	:	হাতে হাত রেখে।
ঘুড়ে বেড়াও	:	কেউ যেন দেখে না ফেলে।
রেস্টুরেন্টে বসো	:	মানিব্যাগ না নিয়ে।
ব্যয় করো	:	প্রেমিকার পার্স থেকে।
পার্কে বসো	:	নির্জন জায়গা দেখে।
চুম্বন করো	:	যতোক্ষণ মন চায়।
প্রতিশ্রুতি দাও	:	শতকরা একশ ভাগ মিথ্যা।
নত হও	:	কাম আদায় পর্যন্ত।
কেটে পড়ো	:	কাম আদায়ের পর।
ফোন করলে	:	রং নাম্বার।
কোথাও দেখা হলে	:	অচেনার ভান করো।
বিয়ে করো	:	বাবা মায়ের পছন্দ মতো।

ঠনঠনিয়া, বগুড়া থেকে

প্রেম শিকারি

- জিল্লুর

আমি একজন প্রেম শিকারি। তাই প্রেমের ফাদে ফেলার জন্য কখনো হয়েছি কবি, কখনো বীর পুরুষ, কখনো ভিজে বিড়াল আবার কখনো ভিক্ষুক। যেখানে যেভাবে যা করা দরকার প্রেমের জন্য আমার তা-ই করা। সহজ লভ্য কাজের মেয়ে থেকে ধনাঢ্য, ধার্মিক, বিবাহিতা অনেকে হয়েছে আমার আয়ত্ব। আজকে লিখবো এ্যানিকে নিয়ে।

এ্যানি আমার ছাত্রী। বয়স ষোল। চঞ্চলতা আর গম্ভীরতা মেশানো চরিত্র। হাসলে গালে টোল পড়ে। মুচকি হাসে বেশি। হাটায় একটা ছন্দ আছে। কথা গুছিয়ে বলে। মাঝারি চুলগুলো বেশির ভাগ সময় শ্যাম্পু করা থাকতো। ওড়না পরে। কিন্তু সঠিক ব্যবহার জানে না বা করে না।

প্রথম দিন এ্যানির ছোট ভাই দরজা খুলে দিল। ড্রয়িংরুমে বসলাম।

পাচ মিনিট পর মা-মেয়ে এক সঙ্গে রুমে প্রবেশ করলো।

তাদেরকে দেখে মনে হলো তারা দুই বোন।

পরিচয় এবং চা চক্রের পর বসলাম পড়াতে। আল্লাহর দেয়া চেহারা, মিষ্টি কথা আমার হাতিয়ার। ছাত্র মধ্যমানের হলেও মানিয়ে নিতে পারি।

পড়িয়ে মেসে এসে পড়লাম চিন্তায়। ফল গাছ লাগাবো, নাকি ফুল গাছ। দুটোই পছন্দ করি।

প্রতিদিন বাড়িতে ঢুকতে এ্যানি দরজা খোলে। মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে চুলে একটা ঝাকি মারে।

পড়ার টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মা আসে। তারপর মাঝে একবার আসে নাশতা নিয়ে।

নাশতার ফাকে তিনজনের চলে গল্প।

সুযোগ পেলেই হাসির কথা বলি।

যাহোক, পড়ানোর সময় এ্যানির পা প্রায়ই আমার পায়ের সঙ্গে লাগে। স্যার, মাফ করেন, বলে চু চু করতো। শেষে বললাম, শোনো, পায়ে লাগলে কিছু হয় না। এক জায়গায় থাকলে লাগতেই পারে। হয়তো তোমার পা আমার পা বন্ধু হবে।

সে হেসে বলে পা, পা বন্ধু হয় নাকি?

বললাম, না মানে, ভিত তো নিচেই থাকে। একশ এক তলাটা শুরু হয়েছে মাটি থেকে। কাজেই বন্ধুত্ব পা থেকেই শুরু হয়।

এ্যানি যখন লেখে তখন চুপি চুপি দেখি।

আমি যখন খাতা দেখি, সে আমাকে দেখে। অর্থাৎ ফুলের সুবাস মৃদু শুরু হয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে একদিন বললো, স্যার, আপনার শখ কি?

বললাম, নায়কের মতো জীবন।

কেন?

বললাম, নায়কেরা সহজে ধনী হয়, সহজে প্রেম পায়। তাই।

সে বললো, মিথ্যুক। অর্থাৎ তার ধারণা, আমি প্রেম করি।

একদিন সিগারেট খেয়েই ঘরে ঢুকেছি। গন্ধটা আমাকে বিব্রত করছে।

সে বলেই ফেললো স্যার, আপনাকে একটি অনুরোধ করবো।

বললাম, বলো।

আপনি আর সিগারেট খাবেন না।

এভাবে তো বললে হবে না। সবচেয়ে বড় শক্তি দিয়ে বলতে হবে।

এ্যানি বললো, বড় শক্তি কি?

বললাম, জেনে নিও।

সে বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন করে জানলো।

একদিন চিরকুটে লিখলো, স্যার, পদ্মার পাড়ে দেখা করবেন ঠিক বারোটায়।

গেলাম। পরে বললাম, শোনো এ্যানি, তোমার সঙ্গে এভাবে বাইরে আলাপ করা ঠিক হবে না।

স্যার, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি দিয়ে বলছি, আপনি আর সিগারেট খাবেন না। কারণ আপনার ক্ষতি, আমার ক্ষতি মনে হয়। এ বলেই সে চলে গেল।

তারপর এ ফুল আমাকে মোহিত করতো প্রতি মুহূর্ত।

একদিন এ্যানিদের বাসায় গিয়ে দেখি এ্যানি নেই। তার মা আছেন। বসে চা খেলাম।

এ্যানির মাকে আপা বলি। তিনি যেভাবে শাড়ি পরে আছেন, কিছুটা দৃষ্টিকটু লাগছে। কিন্তু উপভোগ করছি। জর্জেট শাড়ির মধ্যে নাভিটা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, আপা, কিছু মনে করবেন না। একটি মেয়ে কি জানে একজন ছেলে তার কোন কোন অংশ পছন্দ করে।

বললেন, জানি।

বললাম, আপনার শাড়িটা সুন্দর।

বললেন, ধন্যবাদ।

আজকে তিনি একটু কম কথা বলছেন।

আবার বললাম, আপনি কি আপনাকে খাওয়া, ঘুম বা কোনো কিছুতে ফাকি দেন।

তিনি বললেন, আপনি হয়তো জানেন, এ্যানির আব্বা বিদেশ। ফলে এক খাওয়া বাদে অন্য সব কিছুতেই নিজেকে ফাকি দিই।

বললাম, আপনার কি মনে হয় তিনি বিদেশে ঠিক আছেন।

বললেন, না।

তারপর বাসায় ফিরে আসতে চাইলে তিনি বললেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে।

বললাম, কি খাওয়াবেন।

যা চাইবেন তা–ই।

খাবার জিনিস খাবো না।

তিনি বললেন, কিল খাওয়াবো।

বললাম, তাহলে আসি।

এই বলে গেট পর্যন্ত আসতেই তিনি আবার ডাকলেন। ভেতরে যেতেই বললেন, কিসমিস খাবেন?

তারপর একেবারে কাছে এসে আমার ডান হাত নিয়ে একটা কিস দিলেন।

এরপর সব কিছুই খাওয়ালেন।

এভাবে প্রায় দুই মাস ষোল এবং বত্রিশের মাঝে আমি পচিশ *তা থৈ তা থৈ* খেললাম।

একদিন এ্যানি স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় অসময়ে আমাকে দেখে হকচকিয়ে যায়। আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

তারপর আর পড়াতে যাইনি।

আট বছর পর এক মেলায় এ্যানির সঙ্গে আমার দেখা। সে কথা বলতে না চাইলেও জোর করে কথা বলে ক্ষমা চাইলাম।

দুই ফোটা অশ্রু উপহার দিয়ে বললো, আমি তোমাকে খুব ভালোবেসেছিলাম। এখন খুব ঘৃণা করি।

তার পথের দিকে তাকিয়ে তার কথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলাম।

কানাইখালি, নাটোর থেকে